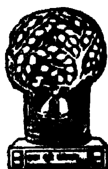
রাষ্ট্রীয় জীবনচরিতমালা

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজনকার

অনুবাদক

শ্রীসুনীলকুমার বসু



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

নয়া দিল্লী

আগষ্ট, ১৯৬০

এক টাকা পচাত্তর পয়সা

PANDIT BHATKHANDE
(*Bengali*)

সেক্রেটারী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়া দিল্লী-১৩ কর্তৃক প্রকাশিত
ও শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্তৃক নাভানা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড,
৪৭নং গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

ভূমিকা

ভারতবর্ষের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ একটী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যুগ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর এই ভাগে অর্থাৎ ১৮৫০ হইতে ১৯০০ সালেব মধ্যে ভারতবর্ষে অনেকগুলি অসাধারণ ব্যক্তির আবির্ভাব হয় যাঁহারা ভারতের জাতীয় জীবনের সমস্ত বিভাগ নূতন প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা কবিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলক, বাংলা দেশে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, পাঞ্জাবে লালা লাজপৎ রায় এবং রাম তীর্থ, দক্ষিণে স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া এবং শ্রীকস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গার প্রমুখ বহু অসাধারণ ব্যক্তি জাতীয় জীবনের নব উন্মেষের পুরোধা ছিলেন।

বস্তুতঃ এই যুগ ছিল ভারতের পুনর্জাগরণের যুগ। এ সময়ে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহাদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা প্রণালীর মাধ্যমে ভারতের বুদ্ধিজীবিরা পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে আসিতে সুরু করিয়াছেন। নূতন চিন্তা, নূতন আদর্শ ও নূতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে নূতন চেতনার সঞ্চার করিতেছিল। দেশের চিন্তানায়ক-গণ ও নেতৃবৃন্দ ভারতের অতীত গৌরব পুনরুজ্জীবিত করিতে এবং অপরদিকে নূতন বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হইলেন। জাতীয়তা বোধ, অতীত ভারতের ঐতিহ্য-

চেতনা এবং গণতান্ত্রিক ভাবনা এই চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ ফল।

মহারাষ্ট্রে একদল নিঃস্বার্থ ও ব্রতী নবীন কর্ম্মীর অভ্যুত্থান হইতেছিল। মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ও বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুনকরের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া একদল নব যুবক জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করা, তাহাদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা জাগানো এবং গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী সমাজকে পুনর্বিন্যাসের কাজে উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। এই নূতন উদ্দীপনায় সংস্কৃতির সকল মাধ্যম যথা,—শিক্ষা, সাহিত্য, রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদির ব্যবহারের প্রয়োজন হইয়াছিল। জীবনের প্রতি দৃঢ় নীতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী এই আদর্শবাদের ফলস্বরূপ।

আমাদের অতীত গৌরবের পুনরভ্যুত্থানের জন্য জাতীয় সংস্কৃতির মৌলিক অঙ্গ হিসাবে সঙ্গীতকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টাও চলিয়াছিল। তখন পর্য্যন্ত সঙ্গীত একদল কল্পনাহীন ও অশিক্ষিত শিল্পীদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং মুষ্টিমেয় ধনীর অধিকারে এবং তাঁহাদের ব্যসনের বস্তু হইয়া দাড়াইয়াছিল। পুনরুত্থান ও নবসংগঠনের আগ্রহ এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে প্রয়াসী হইল। এই আন্দোলনের পথপ্রদর্শক ছিলেন দুই উৎসাহী যুবক,—বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে (পণ্ডিত ভাতখণ্ডে নামে অধিক পরিচিত) এবং বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর বা পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর। এই দুই বিষ্ণু সঙ্গীতের উন্নতির কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

এই কারণেই ইঁহাদের জীবনী পাঠ না করিয়া এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁহাদের বিপুল অবদানের কথা না জানিয়া কোনও

ভূমিকা

সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষার্থীর শিক্ষা আরম্ভ হইতে পারে না। যদিও এই দুইজন ছিলেন সমসাময়িক, কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দুজনে যে কাজ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা ছিল বিভিন্ন ধরনের। প্রাচীন ও সমসাময়িক ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে গভীর অধ্যয়ন করিয়া ভাতখণ্ডে ভারতীয় সঙ্গীতকে বিধিবদ্ধরূপ দিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পালুসকর চেষ্টা করিয়াছিলেন সঙ্গীতকে জনসমাজের মধ্যে বিস্তার করিয়া ইহাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে। সমাজের প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ প্রশংসা করিলেও তখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে হেয় সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীত শুনিয়া এবং সমাজের নীচু স্তরের মানুষ বলিয়া মনে করিতেন। তখনকার দিনে সঙ্গীতকলার ও সঙ্গীতশিল্পীদের দুর্দ্দশা এখনকার দিনের লোকেরা সহজে কল্পনা করিতে পারিবেন না। এই দুই দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি সঙ্গীত-কলা ও সঙ্গীতজ্ঞদের উন্নতির জন্য অদম্য সাহস ও দৃঢ় সংকল্প লইয়া জীবনভোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টার গৌরব এই যে তাঁহাদের জীবদ্দশাই সে উদ্দেশ্য প্রায় সফল হইয়াছিল।

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের এই জীবনী পদ্মভূষণ ডাঃ শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজনকার লিখিয়াছেন।

নিউ দিল্লী

বি. ভি. কেশকার

১

১৮৫৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পর তিন বৎসর অতীত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে বহ্নিলীলা নির্ব্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু বাহ্য শান্তির ভস্মের নিচে আগুন তখনও ধিক্ ধিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। লোকমান্য তিলক, লাজপত রায়, বিপিনবিহারী পাল, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, ফিরোজ শা মেটা প্রমুখ মহান ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কেহ কেহ তখন সবে মাত্র হাঁটিতে ও কথা বলিতে সুরু করিয়াছেন, কেহ কেহ তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইঁহারাই পরবর্ত্তীকালে জাতিকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ইঁহারা ছিলেন মহান পথিকৃৎ। মহাত্মা গান্ধীর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া ইঁহারা পথ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন, পরে মহাত্মা ভারতকে বিদেশী অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করেন।

কর্ম্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও পণ্ডিত ভাতখণ্ডে একজন জাতির নির্ম্মাতা ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল হিন্দুস্থানী সঙ্গীত। এই ক্ষেত্রে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ছিলেন যুগপ্রবর্ত্তনকারী সর্ব্বভারতীয় নেতা এবং ভারতের কৃষ্টির প্রতীক স্বরূপ।

বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে নামে সারাদেশে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার জন্ম হয় ১৭৮২ শকাব্দের জন্মাষ্টমী

তিথিতে অর্থাৎ ইংরাজী ১০ই আগষ্ট ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। পিতা নারায়ণরাও ভাতখণ্ডে ছিলেন বোম্বাই-এর একজন বড় ভূস্বামীর ম্যানেজার ও হিসাবরক্ষক। ইঁহার তিন পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র আপ্পাজী বোম্বাই প্রদেশের পুলিশ বিভাগের অফিসার ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র গজানন সাধারণের কাছে বিষ্ণু নামে পরিচিত ছিলেন। এই দ্বিতীয় পুত্রের জীবনী ও কার্য্যকলাপ এই পুস্তকের বিষয়বস্তু। তৃতীয় পুত্রের নাম হরিভাউ। তিনি বোম্বাই-এর একটী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ আপ্পাজী একটী পুত্র রাখিয়া অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। বিষ্ণুর একটী কন্যাসন্তান হইয়াছিল। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই পত্নী ও কন্যার মৃত্যু হয়।

সমুদ্রতীরে মালাবার পাহাড় নামে একটী টিলার পাদদেশে বালুকেশ্বর নামে একটী পবিত্র স্থানে এই ভাতখণ্ডে পরিবার বাস করিতেন। বালুকাময় একটী স্থানে শিবের একটী মন্দির ছিল। বালুকেশ্বর শিবের মন্দিরের নাম অনুসারে এই স্থানটীর নামকরণ হয় বালুকেশ্বর। এই মন্দিরটির সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। তবে পুরাতন বোম্বাই দ্বীপটী যখন ইংলণ্ডের দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহের যৌতুকস্বরূপ পর্ত্তুগীজ সরকার ইংরাজকে দান করেন, মনে হয় এই মন্দিরটী তখন এখানে ছিল। এখন মালাবার পাহাড় ও বালুকেশ্বর বা বালকেশ্বর বোম্বাই-এর সুপরিচিত স্থান।

অনুমান হয় কোঙ্কনের নাগাওঁ গ্রাম হইতে এই ভাতখণ্ডে পরিবার বোম্বাই আসিয়া বসবাস সুরু করেন। বালুকেশ্বরে নারায়ণরাও ভাতখণ্ডের গৃহে শ্রীদত্তাত্রেয় দেবের একটী ক্ষুদ্র

মন্দির ছিল। শ্রীদত্তাত্রেয় ছিলেন ভাতখণ্ডে পরিবারের গৃহদেবতা। ইঁহারা সরল লোক ছিলেন, জীবনযাত্রাও ছিল সাদাসিধে। সচ্ছলতা তাঁহাদের জীবনে ছিল না।

বিষ্ণুর মধ্যে সঙ্গীত-প্রতিভা সুপ্ত ছিল। শৈশবে মায়ের ঘুমপাড়ানী গান শুনিতে শুনিতে সেই সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত হয়। পিতাও সঙ্গীত-জগতে অপরিচিত ছিলেন না। ভারতীয় তারযন্ত্র স্বরমণ্ডল বাজাইতে তিনি ভালবাসিতেন। কিন্তু পিতা-মাতার মনে কোনও ইচ্ছা বা প্রত্যাশা ছিল না যে, তাঁহাদের সন্তান সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করিবে কিম্বা কখনও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে নবজীবন দান করিবে। তখনকার দিনে সঙ্গীতকে নিষ্কর্মা অপদার্থ লোকের পেশা বলিয়া মনে করা হইত। অশিক্ষিত লোকেরাই এই পেশা গ্রহণ করিত। সম্ভ্রান্ত সমাজে গায়কের স্থান ছিল না, তাঁহারা গায়কদের বদলোক বলিয়া মনে করিতেন। যাহা হউক, বালকবয়স হইতেই বিষ্ণুর অন্তর সঙ্গীতের মাধুর্য্যে বিভোর ছিল এবং ক্রমশঃ সঙ্গীত তাঁহার মনকে এমনভাবে অধিকার করিয়াছিল যাহাতে সমগ্র দেশে এই কলার বিস্তারে সহায়তা করিয়াছিল। শৈশবে মধুর কণ্ঠে শিশুদের উপযোগী সঙ্গীত গাহিয়া ও কবিতা আবৃত্তি করিয়া বিদ্যালয়ে অনেক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি বাঁশী বাজানোর দিকে আকৃষ্ট হন। তখন বালুকেশ্বর অঞ্চলটি মাড়োয়ারী, গুজরাটী ও গোঁসাই সম্প্রদায়ের লোকে পূর্ণ ছিল। তাঁহারা সকলেই ছিলেন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁহারা নৃত্য, গীত ও নাটকের মধ্য দিয়া দেবতার আরাধনায় নিরত ছিলেন। রামনবমী, জন্মাষ্টমী, দেওয়ালী, হোলি ইত্যাদি

উৎসবগুলি সকলে মিলিয়া বিপুল উৎসাহ, আনন্দ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্‌যাপন করিতেন। এই উৎসবগুলির মধ্যমণি ছিলেন তরুণ বিষ্ণু। সর্ব্বদাই তাঁহাকে নেতা হিসাবে পুরোভাগে দেখা যাইত। যে-কোনও উৎসবে বিষ্ণু ছিলেন অপরিহার্য্য, কেননা সঙ্গীত ভিন্ন নাটক কেমন করিয়া সম্ভব হয়? বালক বিষ্ণু (যিনি তখন রাজু নামেও অভিহিত হইতেন) ছিলেন বালুকেশ্বরে একমাত্র শিল্পী যিনি কণ্ঠে ও বাঁশীতে সঙ্গীত যোগাইতেন। বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক কার্য্যক্রম ও দৈনন্দিন জীবনের বাঁধাধরা কাজের মধ্যে সঙ্গীত অনেক মাধুর্য্য আনিয়া দিত। বিষ্ণুর মত বুদ্ধিমান ও প্রখরস্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বালকের নিকট বিদ্যালয়ের পাঠ গুরুভার বোধ হইত না। ক্লাশের পাঠের মধ্যেই অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ও ভাষা শিক্ষা হইয়া যাইত, সঙ্গীতচর্চ্চার ফলে লেখাপড়ার কোন বিঘ্ন হইত না। কিন্তু পিতামাতা চিন্তিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আশঙ্কা হইল বিষ্ণু সঙ্গীতেই ডুবিয়া থাকিবেন এবং কালক্রমে ভবঘুরে হইয়া যাইবেন। তাঁহারা বারংবার সঙ্গীতমওতার বিষয়ে বিষ্ণুকে সতর্ক করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণু ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করিয়া কলেজে প্রবেশ করিলেন। তিনি এলফিনষ্টোন হাই স্কুলে লেখাপড়া করেন। এই স্কুলটী ঐ সময়ে বিষ্ণুদের বাড়ি হইতে ৫।৬ মাইল দূরে প্যারেলের নিকট অবস্থিত ছিল।

এবার স্কুলের ছাত্র বিষ্ণুর দিকে একবার তাকানো যাক। গৌরবর্ণ দীর্ঘ তনু, সেকালের ব্রাহ্মণদের প্রথায় মুণ্ডিত মস্তক, প্রশস্ত কপাল, উজ্জ্বল প্রাণময় দুইটী চক্ষু, উন্নত নাসা, প্রশস্ত

বক্ষ, দীর্ঘ বাহু, পরণে ধুতি ও সার্ট, মাথায় গোল টুপি, এই হইল তখনকার বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের চিত্র। যে দলেই থাকুন না কেন, সেখানেই তিনি নেতা। স্কুলের সহপাঠীদের সপ্রশংস আনুগত্য ছিল বিষ্ণুর প্রতি। তখনকার দিনে বোম্বাই-এ বাস বা ট্রাম ছিল না। মোটর গাড়ি ও ভিক্টোরিয়া গাড়ি ছিল একমাত্র যানবাহন। বিষ্ণুদের মত স্বল্প আয়ের পরিবারে মোটর গাড়ির প্রশ্ন ওঠে না। ভিক্টোরিয়া গাড়িতেও (ঘোড়ায় টানা গাড়ি) দৈনিক অন্ততঃ দু'টী টাকা খরচ। ইহাও ছিল বিষ্ণুদের সাধ্যাতীত। সুতরাং এই দীর্ঘপথ বিষ্ণু সহপাঠীদের সঙ্গে পদব্রজেই যাইতেন। তাঁহাদের যাত্রাপথটি নানা বিষয়ে সুন্দর রসালাপে বিষ্ণু সজীব করিয়া রাখিতেন। শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার স্বভাবের এই আনন্দময়তা ও সৌজন্য অক্ষুণ্ণ ছিল। দীর্ঘদেহী ছিলেন বলিয়া বিষ্ণু দ্রুত হাঁটিতেন। অনেক সময় তাঁহার সহিত তাল রাখিতে সঙ্গীরা ক্লান্ত বোধ করিতেন।

কলেজে প্রবেশ করিয়া বিষ্ণু সেতার বাজানো আরম্ভ করিলেন। বালুকেশ্বরে গোপাল গিরি নামে একজন গোঁসাই সম্প্রদায়ের ভদ্রলোক সেতার বাজাইতেন। তিনি ছিলেন বীণকার হুসেন খাঁর শিষ্য। ইহার সেতার বাজনা শুনিয়া বিষ্ণুর অন্তরে সেতারের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। বল্লভদাস দামুলজী নামে বোম্বাই-এর একজন অন্ধ ভাটিয়া ভদ্রলোকের সঙ্গে বিষ্ণুর আলাপ হয়। বল্লভদাস ছিলেন সেতারী ও বীণকার। বোম্বাই-এর ভুলেশ্বরের একটী বৈষ্ণব মন্দিরের প্রধান আচার্য্য জীবনলাল মহারাজের নিকট বল্লভদাস সেতার শিক্ষা

করেন। জীবনলাল মহারাজ আবার বেনারসের পান্নালাল বাজপেয়ীর শিষ্য ছিলেন। তখনকার দিনে জীবনলাল মহারাজ ছিলেন বোম্বাই-এর মধ্যে নামকরা বীণাবাদক। এমন কি পেশাদার ওস্তাদেরাও একথা স্বীকার করিতেন। শুনা যায় যে তিনি তাঁর প্রিয় চারটী রাগ দরবারী কানাড়া, বাগেশ্রী, কেদারা ও মালকোষ এমন চিত্তাকর্ষকভাবে বাজাইতেন যে, তাহা শ্রোতাদের মনে বহুদিন পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকিত।

বল্লভদাস দামুলজীর প্রচুর অর্থ ছিল। জীবনধারণের জন্য তাঁহার কোনও চিন্তা ছিল না। অন্ধ বলিয়া তিনি সঙ্গীতচর্চ্চাতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং জীবনলাল মহারাজের শিষ্যত্বে সেতার ও বীণাবাদনে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। বল্লভদাস বালুকেশ্বরের নিকটেই বাস করিতেন। তরুণ বিষ্ণু তাঁহার কাছে সেতার শিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি সম্মত হইয়া প্রতিদিন গভীর রাত্রে বিষ্ণুকে তাঁহার নিকটে আসিতে বলিলেন। এই সময়ে বল্লভদাস সেতার ও বীণার সাধনা করিতেন। তিনি পেশাদার বাদক ছিলেন না, তাই বিষ্ণুর নিকট কোনও অর্থ দাবি করিলেন না। পিতামাতা আপত্তি করিবেন বুঝিয়া বিষ্ণু গোপনে বল্লভদাসের গৃহে যাইতেন। এইভাবে বীণাবাদন শুনিতে শুনিতে দুই তিনমাস অতিবাহিত হইল। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিষ্ণুকে কোনও পাঠ দেন নাই। তখনকার দিনের প্রথা অনুযায়ী বিষ্ণুকে গুরুর কিছু কিছু ব্যক্তিগত কাজও করিতে হইত। গুরুর বীণা ও সেতার বাজনা শুনিয়া বিষ্ণু একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। পাঠ গ্রহণ না করিয়াও

তিনি নিয়মিতভাবে গুরুগৃহে যাইতেন। বোধ হয় বল্লভদাস তাঁহার শিষ্যের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতেছিলেন। গুরুর সেতার-বাদন বিষ্ণু গভীরভাবে নিরীক্ষণ করিতেন। বিভিন্ন স্বরের উপর গুরুর আঙুলের কাজ এবং তারের উপর ঝঙ্কারের কৌশল তিনি মনে মনে আয়ত্ত করিয়া লইতেন। একটী সেতার সংগ্রহ করিয়া বিষ্ণু নিজেই সাধনা সুরু করিলেন গোপাল গিরির সহযোগিতায়। ছাত্রের আগ্রহের গভীরতা সম্বন্ধে বল্লভদাস যখন নিশ্চিত হইলেন তখন বিস্মিত গুরু দেখিলেন বিষ্ণু ইতিমধ্যেই অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। শৈশব-কাল হইতে গান গাহিয়া ও বাঁশী বাজাইয়া বিষ্ণুর স্বরজ্ঞান জন্মিয়াছিল। তাই সহজেই তিনি গৎ ও তোড়ার পাঠ আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। ছাত্রের দক্ষতা দেখিয়া বল্লভদাস অত্যন্ত খুসী হইলেন এবং অসীম যত্নের সঙ্গে শিষ্যকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অল্পদিন পর বিষ্ণু ছোট ছোট আসরে সেতার বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। বন্ধু এবং গুণগ্রাহীর একটী দল বিষ্ণুর সেতাব বাজনা শুনিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক হইয়া থাকিতেন। ক্রমে সারা বোম্বাই সহরে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। কলেজের পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুর সঙ্গীত-সাধনা চলিতে লাগিল।

২

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বোম্বাই সহরের সঙ্গীত-জগৎ ঘটনাবৈচিত্র্যে পূর্ণ ছিল। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের অব্যবহিত পরে রাজা-মহারাজাদের আনুকূল্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বহু সঙ্গীতজ্ঞ ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সহর বোম্বাই ও কলিকাতায় চলিয়া আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অনেকেই ছিলেন মুসলমান। এই সব নগরে তাঁহাদের রাগাশ্রিত গীতবাদ্যের আসর বসিতে আরম্ভ হইল। বন্দে আলি খাঁ, আলি হোসেন খাঁ প্রমুখ বীণকারগণ, পান্নালাল বাজপেয়ী সেতারিয়া এবং তানরস খাঁ, ইনায়েৎ খাঁ, নিসার হুসেন খাঁ, নাথান খাঁ ও হদ্দু খাঁয়ের দুই পুত্র মহম্মদ খাঁ ও রহমৎ খাঁ প্রভৃতি বিশিষ্ট গায়কগণ বোম্বাই সহরে আসিয়া গান-বাজনা শুনাইতে লাগিলেন। এই গায়কগণ বংশপরম্পরাগত পদ্ধতির খেয়াল গায়ক ছিলেন। বীণাবাদনে বন্দে আলি খাঁ ও হুসেন খাঁ-এর কোনও জুড়ি ছিল না। বন্দে আলি খাঁ-এর সঙ্গে সর্ব্বদা চুন্না নামে একজন শিষ্যা থাকিতেন। তিনি তাঁহার মধুর কণ্ঠসঙ্গীতের মাধ্যমে গুরুর ভাবনাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেন। এই কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে এই সব ওস্তাদদের আশ্চর্য্য দখল দেখিয়া বোম্বাই-এর অধিবাসীদের মধ্যে অনেকে

দরবারী রাগ সঙ্গীতের (Royal Court Art of Ragadari Music) স্থায়ী ভক্ত হইয়া পড়িলেন। বিষ্ণু ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি এই ওস্তাদদের কোনও আসর বাদ দিতেন না।

এই সব মাহফিলে সঙ্গীত সম্বন্ধে বিষ্ণু যে জ্ঞান অর্জ্জন করিতেন তাহা তাঁহার গ্রহণশীল অন্তরে সঞ্চিত হইতে লাগিল। সঙ্গীতের মাধুর্য্য ও সুন্দর গায়ন শুনিয়া বিষ্ণু শুধু যে মোহিত হইলেন তাহা নহে, সুসংবদ্ধ স্বর ও রাগের বিশিষ্ট রূপ ও তান বিস্তার লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে হইল এই কলার নিশ্চয়ই একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। সুরু হইল সঙ্গীতের তত্ত্ব বা থিয়োরী সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পাঠ। সঙ্গীত বিষয়ে সংস্কৃত, মারাঠী, গুজরাটী ও হিন্দী ভাষায় লিখিত যে-সব পুরাতন গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহা পাঠ কবিয়া প্রয়োজনীয় অংশ লিখিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহারই মধ্যে চলিতে লাগিল ছোট ছোট আসরে সেতার-বাদন। এইরূপ একটী আসরে বিষ্ণুর পিতা আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পুত্রের কৃতিত্বপূর্ণ বাজনা শুনিয়া পিতার মনে দুই রকম ভাবেব সৃষ্টি হইল। পুত্রের দক্ষতায় গর্ব্ব এবং সেই সঙ্গে তাহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে চিন্তা। কিন্তু বিষ্ণু যথানিয়মে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বি.এ. এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এল. এল. বি. পাশ করিলেন। বোম্বাই-এর ধনী পার্শী সম্প্রদায় 'গায়ন উত্তেজকমণ্ডলী' নামে একটী সঙ্গীত সংস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণু সেই সংস্থায় যোগদান করেন। পার্শীরা পাশ্চাত্য চালচলন গ্রহণ করিলেও তখন পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের আনুকূল্যে

মাঝে মাঝেই গায়ন উত্তেজকমণ্ডলীতে বিশিষ্ট ওস্তাদদের লইয়া সঙ্গীতের আসর বসিত। বোম্বাইবাসী এবং বাহির হইতেও শিল্পীদের আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইত।

গায়ন উত্তেজকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে বিষ্ণু তানরস খাঁ, ইনায়েৎ হুসেন খাঁ, নাথান খাঁ, আলি হুসেন খাঁ বীণকার-এর মত বড় বড় ওস্তাদদের গান-বাজনা শুনিবার সুযোগ পাইতেন। তিনি খেয়াল, ধ্রুপদ, হোরি, তারানা, ঠুংরী ইত্যাদির প্রামাণিক ও পরম্পরাগত সুবদ্ধ সঙ্গীত-রচনা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধ্রুপদ গায়ক রাওজী বুয়া বেলবাউকর গায়ন উত্তেজকমণ্ডলীর দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতা এবং হায়দরাবাদের জয়নুল আবেদীনের নিকট ধ্রুপদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু প্রায় ৩০০ ধ্রুপদ এই রাওজীর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। গায়ন উত্তেজক মণ্ডলীতে নিযুক্ত দুই গায়ক আলি হুসেন খাঁ এবং তাঁর মামা বিলায়েৎ হুসেনের নিকট হইতে বিষ্ণু অনেকগুলি খেয়াল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সব ঘরানা গানের দ্বারাই তখনকার দিনে প্রচলিত রাগগুলির রূপ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব মনে করিয়া বিষ্ণু অতি প্রয়োজনীয় আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে নূতন কায়ায় সুসংবদ্ধ রূপ দিবার কাজে বুনিয়াদ মনে করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সঙ্গীততত্ত্বের যতগুলি পুরাতন গ্রন্থ পাওয়া গেল বিষ্ণু সব পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, গ্রন্থে লিখিত তত্ত্বের সঙ্গে গায়কদের গীত রাগের বিশেষ মিল নাই। পূর্ব্বযুগের গ্রন্থে লিখিত তত্ত্ব অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। পেশাদার গায়কদের

বেশীর ভাগই মুসলমান। পুরাতন গ্রন্থের সঙ্গে তাঁহাদের কোনও পরিচয় নাই এবং তাঁহারা কেবল নিজ নিজ ঘরানার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া রাগগুলি গাহিতেন ও রাগের উপর সঙ্গীত রচনা করিতেন। পুরুষানুক্রমে অথবা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় এই কলার ঐতিহ্য রক্ষিত হইত। স্বরলিপি করিবার কোনও বিধিবদ্ধ নিয়ম না থাকায় এবং মুখে মুখে প্রচলনের ফলে রাগগুলির রূপ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। পুরাতন গ্রন্থের তত্ত্বের সঙ্গে অমিল হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত ঘরানা বা বংশপরম্পরাগত রাগগুলিই আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভিত্তি। ভাতখণ্ডে এই ভিত্তির উপরেই ভারতীয় সঙ্গীতের সুসংবদ্ধ ঔপপত্তিক রূপরাগের শ্রেণীবন্ধন প্রতিষ্ঠিত করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন।

সঙ্গীতের প্রতি এই বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী এই উত্তেজক-মণ্ডলীর সদস্যদের সোৎসাহ সমর্থন লাভ করিল। তাঁহারা মাঝে মাঝে মণ্ডলীতে বক্তৃতা দিয়া এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিষ্ণুকে অনুরোধ করিলেন। বক্তৃতামালা সুরু হইল। এইভাবে মৌলিক গবেষক এবং সঙ্গীততত্ত্বের ব্যাখ্যাতা হিসাবে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের কর্ম্মজীবনও সুরু হইল।

ইতিমধ্যে আইন ব্যবসাও সুরু হইল। প্রথমে বৎসর-খানেক তিনি করাচীতে ওকালতি করিলেন। ফৌজদারি আইন এবং সাক্ষ্যপ্রমাণঘটিত আইনে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। কয়েক বৎসর তিনি বোম্বাই সহরে আইনের ক্লাশও পরিচালনা করেন। সাক্ষ্যের আইনের বিভিন্ন ধারার উপরে গান রচনা করিয়া বিষ্ণু তাহাতে সুর যোজনা করিয়া ছাত্রদের

শিখাইতেন। এই পদ্ধতিতে ছাত্রেরা অতি সহজে আইনের ধারা-উপধারাগুলি মুখস্থ করিয়া ফেলিত। বিষ্ণু জেরা করায় সুদক্ষ ছিলেন। কদাচিৎ কোনও মোকদ্দমায় তাঁহার হার হইত।

এই সময়ে বোম্বাই সহরের একজন আইনজীবী প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। বিষ্ণু ঐ বিরাট সম্পত্তির ট্রাষ্টি নিযুক্ত হইলেন। ইহার নাম ছিল শান্তারামনারায়ণ পাটকর। ইহার বিধবা কন্যা শ্রীমতী ঢকলীবাই সুখতনকর ছিলেন পিতার উত্তরাধিকারিণী। ঢকলীবাই-এর পুত্রকন্যাগণ ছিলেন নাবালক, তিনি নিজেও এই সম্পত্তি দেখাশুনা করিতে অপারগ ছিলেন। পাটকরের একখানি বাড়ি ছিল বালুকেশ্বরের সমুদ্র-কূলে। তিনি ভাতখণ্ডের পরিবারকে জানিতেন। বিষ্ণুর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আইনগত যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার খুব উচ্চ ধারণা ছিল বলিয়া তিনি তাঁহার সম্পত্তি দেখাশুনার ভার বিষ্ণুকে দিয়া গেলেন।

৩

প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতে গিয়া ভাতখণ্ডে দেখিলেন যে, এগুলির ভাষা অনেক স্থানে প্রাঞ্জল নয় অথবা দ্ব্যর্থবোধক। তখন যে-সব নিয়ম ও শব্দার্থ প্রচলিত ছিল এখন তাহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। যেমন ভরতের শাস্ত্রে মাত্র নয়টী স্বর ছিল, সাতটী শুদ্ধ ও দু'টী বিকৃত বা চ্যুত স্বর। শার্ঙ্গদেব বিকৃতষড়জ ও পঞ্চমের উল্লেখ করিয়াছেন, এ দু'টী বর্ত্তমানে হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী উভয় ধারার সঙ্গীতেই অচল স্বর। কর্ণাটকী সঙ্গীতের শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের নামের সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের স্বরের নাম পর্য্যন্ত বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই পরিস্থিতি ভাতখণ্ডের কাছে বিভ্রান্তিকর বলিয়া মনে হইল। দু'টী সঙ্গীতপদ্ধতির মৌলিক ভাবধারা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু কর্ণাটকী সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞদের সহিত সরাসরি আলোচনা ছাড়া তাহা সম্ভবপর নয়।

এইসময়ে ভাতখণ্ডে বড় বড় শিল্পীদের দ্বারা প্রচলিত ও পরম্পরাগত সঙ্গীতের বন্দিশ ও রূপায়ণ মনোযোগসহকারে শুনিয়া তাহার ভিত্তিতে সঙ্গীতের তত্ত্ব ও রাগের নিয়মাবলীর সূত্র রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে যে-সব সমস্যা দেখা দিত তাহা মণ্ডলীতে আমন্ত্রিত শিল্পীদের সঙ্গে তিনি

আলোচনা করিতেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন তাহা লিখিয়া রাখিতেন। মণ্ডলীর আসরে তিনি বন্ধুবর্গকে তাঁহার সংগৃহীত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি পড়িয়া শুনাইতেন। এইভাবে ইতিমধ্যেই তাঁহার 'লক্ষ্যসঙ্গীত' ও 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতি' রচনার সুরু হইল।

রাওজী বুয়া আনুমানিক ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নাজির খাঁ নামে একজন ওস্তাদ মণ্ডলীতে নিযুক্ত হন। তিনি তখনকার দিনে বোম্বাই-এর একজন নাম-করা সারেঙ্গীবাদক ছিলেন। তিনি ইনায়েৎ হোসেন খাঁ-এর মত প্রবীণ ওস্তাদদের কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে সারেঙ্গীতে সঙ্গত করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ গানও করিয়াছিলেন। তিনি কিছু কিছু ঘরানা সঙ্গীত শিখিয়াছিলেন এবং তাহা দক্ষতার সঙ্গে গাহিতেও পারিতেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে নাজির খাঁ-এর অভিজ্ঞতা এবং ভূয়োদর্শিতা ছিল। পেশাদার ওস্তাদেরা বিষ্ণুর সঙ্গীত সম্পর্কীয় বক্তৃতায় আগ্রহশীল ছিলেন না। কিন্তু নাজির খাঁ সেরূপ ছিলেন না। বক্তৃতায় বিষ্ণু যেভাবে সঙ্গীতের তত্ত্ব বা থিয়োরী এবং রাগের সূত্রগুলি সহজ ও পরিষ্কার ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেন তাহা শুনিয়া নাজির খাঁ বিশেষভাবে প্রভাবিত হইলেন। নাজির খাঁ-এর এক শিষ্য মিঃ বাদিলাল শিববাম ছিলেন একটী গুজরাটী নাট্যদলের সুরকার ও সঙ্গীতপরিচালক। তিনি মিঃ বাদিলালকে ভাতখণ্ডের নির্দ্দেশনায় সঙ্গীতশাস্ত্র সম্পর্কে অধ্যয়ন করিবার জন্য লইয়া গেলেন। মিঃ বাদিলাল সংস্কৃত সাহিত্যেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি দেখিলেন ভাতখণ্ডে কেবল সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ নহেন, তাঁহার নিকটে অনেক ঘরানা

সঙ্গীতের সংগ্রহ আছে এবং তিনি এই সঙ্গীতগুলি মধুর কণ্ঠে নিভুর্লভাবে গাহিতেও পারিতেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে বিষ্ণুর জ্ঞান, গাহিবার ক্ষমতা, উচ্চশিক্ষা ও উন্নত কৃষ্টি বাদিলালের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। তিনি ভাতখণ্ডের স্থায়ী অনুরাগী ভক্ত হইয়া গেলেন। এই অনুরক্তি এত গভীর ছিল যে, ভাতখণ্ডের মৃত্যুর পরেও বাদিলাল এই ব্যাপারে সমান উৎসাহী ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে যতগুলি পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন বাদিলাল তাহা পাঠ করিলেন এবং ভাতখণ্ডের নির্দ্দেশমত শত শত ঘরানা সঙ্গীত শিক্ষা করিলেন।

বাদিলাল যখন নাজির খাঁ-এর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছিলেন সেই সময় নাথান খাঁ-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ খাঁ-এর সহিত তাঁহার প্রায়ই দেখা হইত। ভিণ্ডি বাজারে নাজির খাঁ-এর গৃহের নিকটে মহম্মদ খাঁ থাকিতেন। তিনি প্রায়ই নাজির খাঁ-এর গৃহে যাইতেন। কণ্ঠের কোনও ত্রুটী থাকার জন্য কোনও জলসায় গান না করিলেও মহম্মদ খাঁ অনেক ঘরানা সঙ্গীত উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাদিলাল ও মহম্মদ খাঁ-এর মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। বাদিলাল প্রায়ই সঙ্গীত বিষয়ে ভাতখণ্ডের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিতেন, বিশেষতঃ তাঁহার ওস্তাদদের নিকট হইতে পারম্পরিক সঙ্গীত শিখিবার গভীর আগ্রহ এবং সেজন্য ওস্তাদদের অর্থ দিবার ইচ্ছার কথারও উল্লেখ করিতেন। একদিন বাদিলাল ও মহম্মদ খাঁ একত্রে ভিণ্ডি বাজারের পথ দিয়া যাইতেছিলেন। সহসা মহম্মদ খাঁ থামিয়া গেলেন,

বাদিলালের স্কন্ধে মৃদু আঘাত করিয়া পথের অপর দিক দিয়া চলমান একটী মুসলমান যুবককে দেখাইয়া বলিলেন, "মিঃ বাদিলাল, তোমার গুরু ভাতখণ্ডেজী ঘরানা সঙ্গীত (চিজা) শিখিবার জন্য বিশেষ উৎসুক। ঐ যুবকটী তাঁহাকে যত ইচ্ছা তত সঙ্গীত শিখাইয়া দিতে পারে। উহার নাম আশক আলি খাঁ, জয়পুরের মহম্মদ আলি খাঁ-এর পুত্র। পুরাতন ঘরানা সঙ্গীতের অজস্র সংগ্রহ থাকার জন্য ওদের পরিবারটী কোঠিওয়ালা নামে খ্যাত। বর্ত্তমানে আশক আলি খাঁ-এর আর্থিক অবস্থা ভাল যাইতেছে না, অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টাতেই ও বোম্বাই আসিয়াছে। যদি ইচ্ছা কর তবে তুমি ওকে ভাতখণ্ডেজীর নিকট লইয়া যাইতে পার।" বাদিলাল উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং তখনই তাঁহার সহিত পরিচয় করিলেন। পরদিন তিনি ভাতখণ্ডেকে এই খবর জানাইলেন এবং আশক আলির সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। আশক আলির কণ্ঠে কয়েকটী খেয়াল শুনিয়া ভাতখণ্ডে বুঝিলেন সেগুলি মহা-মূল্যবান এবং তখনই কিছু মাসিক মাহিনার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে খেয়াল শিখাইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। আশক আলি খেয়াল গাহিতেন, তাহা শুনিয়া ভাতখণ্ডে তালের নির্দ্দেশক চিহ্নসহ সেগুলির স্বরলিপি প্রস্তুত করিতেন এবং পরে সেই স্বরলিপি দেখিয়াই গান গাহিতেন। গানগুলি ভাতখণ্ডে এত শীঘ্র শিখিয়া লইয়া গাহিতে লাগিলেন দেখিয়া আশক আলি বিস্মিত হইয়া গেলেন। দুই তিন মাসের মধ্যে ভাতখণ্ডে প্রায় ২৫০টী খেয়াল আয়ত্ত করিয়া স্বরলিপি তৈয়ার করিয়া ফেলিলেন।

এই সংবাদ বোম্বাই-এর ওস্তাদদের নিকট পৌঁছিল। জয়পুরে মহম্মদ আলি খাঁ-এর নিকট চিঠি পাঠানো হইল। সেই বৃদ্ধ গায়ক অবিলম্বে বোম্বাই সহরে আসিয়া ভাতখণ্ডের গৃহে উপস্থিত হইয়া আশক আলির নিকটে শেখা খেয়ালগুলি তাঁহাকে গাহিতে বলিলেন। ভাতখণ্ডে তাঁহার খাতাটী খুলিয়া স্বরলিপি দেখিয়া খেয়ালগুলি গাহিলেন। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক অসংবরণীয় ক্রোধে অধীর হইয়া পুত্রকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার ঘরের মূল্যবান রত্নগুলি নিঃশেষ করিয়া দিয়াছ। পরিবারের এই অমূল্য সম্পদ অপরকে প্রদান করিবার পূর্ব্বে ক্ষুধায়, অভাবে তোমার মৃত্যু হওয়া শ্রেয় ছিল।" ভাতখণ্ডে নিজেকে সংবরণ করিতে পারিলেন না। অশ্রুপূর্ণনয়নে তিনি সেই বৃদ্ধ ওস্তাদের পদতলে পড়িয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ইহার জন্য আপনার পুত্র দায়ী নয়, আমিই তাহার আর্থিক অসচ্ছলতার সুযোগ লইয়াছিলাম। এখন আমি আপনার শিষ্য। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যে খেয়ালগুলি আপনার পুত্রের নিকট হইতে শিখিয়াছি তাহার অপব্যবহার হইবে না। আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম এবং সর্ব্বদা সে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব।" এই আন্তরিক আবেদনে খাঁ সাহেব শান্ত হইলেন। ঝড় কাটিয়া গেল। ভাতখণ্ডে অতঃপর খাঁ সাহেবকে তাঁহার স্বরলিপির খাতা ও শিক্ষাকৃত সঙ্গীতের পূর্ণ তালিকা দেখাইলেন, কিছু কিছু গাহিয়াও শুনাইলেন। সঙ্গীত বিষয়ে তিনি যে কাজ করিতে অগ্রণী হইয়াছেন তাহার একটী মোটামুটি রূপরেখা খাঁ সাহেবকে দেখাইলেন এবং

কয়েকটী লক্ষণ গীত গাহিয়া শুনাইলেন। মহম্মদ আলি খাঁ এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি আরও কয়েকটী গান শিখাইয়া দিতে চাহিলেন। ভাতখণ্ডে সেগুলি শিখিয়া লইলেন এবং খাতায় স্বরলিপি করিয়া লিখিয়া রাখিলেন। অধিকন্তু মহম্মদ আলি খাঁ ও আশক আলির নিজকণ্ঠে গীত এই খেয়ালগুলির গ্রামোফোন রেকর্ড করাইয়া রাখিলেন। এগুলি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অমূল্য ঐতিহাসিক তথ্য হইয়া থাকিতে পারিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ভাতখণ্ডের অজানিতে এগুলি এমন জায়গায় রাখা হইয়াছিল যে, কীটে ও মূষিকে এগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। মহম্মদ আলি খাঁ ও আশক আলি খাঁ-এর নিকট হইতে ভাতখণ্ডে প্রায় তিনশতটী খেয়াল ও সাদ্‌রা শিখিয়াছিলেন। পিতা ও পুত্রকে তিনি উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়াছিলেন। তিনি মহম্মদ আলি খাঁকে নিজ গুরু বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার রচিত 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি' গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় প্রত্যহই মণ্ডলীতে নাজির খাঁ-এর সহিত ভাতখণ্ডের দেখা হইত এবং সঙ্গীত-বিষয়ে আলোচনা হইত। তা ছাড়া বাদিলালের নিকট হইতেও নাজির খাঁ ভাতখণ্ডের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে জানিতে পারিতেন। নাজির খাঁ ছিলেন দিলখোলা, নম্র স্বভাবের লোক। তিনি ধীরে ধীরে ভাতখণ্ডের অনুরাগী ও বন্ধু হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাতখণ্ডের নিকট হইতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ঔপপত্তিক তত্ত্বের কয়েকটী বিষয় শিক্ষা করিলেন এবং কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ভাতখণ্ডে কণ্ঠসঙ্গীতের মাধ্যমে রাগের

সংজ্ঞাদান (লক্ষণ-গীত) রচনা সুরু করিলেন এবং তাহার কয়েকটী নাজির খাঁকে শিখাইয়া দিলেন। নাজির খাঁ আবার বোম্বাই-এর অঞ্জনীবাঈ মালপেকার, লক্ষ্ণৌ-এর অচ্ছনবাঈ প্রমুখ শিষ্য-শিষ্যাদের তাহা শিখাইয়া দিলেন।

এই সময়ে স্ত্রী ও শিশুকন্যার মৃত্যুতে ভাতখণ্ডে জগতে একাকী হইয়া গেলেন। এই শোকের পরে আদালতে আইন-ব্যবসায় ও গৃহে সঙ্গীত তাঁহার জীবন পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী চকলীবাঈ সুখতনকার দক্ষিণ ভারতের তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিতে যাইবাব প্রস্তাব করিলেন। তিনি ভাতখণ্ডেকে তাঁহাদের সহিত যাইতে অনুরোধ করিলেন। এইভাবে সুরু হইল ভাতখণ্ডের দক্ষিণ ভারত সফর। গবেষণার প্রয়োজনে ও সুবিধার্থে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ সম্পর্কে ভাতখণ্ডে বলিয়াছেন, "আমাদের মধ্যে একটী ধারণা প্রচলিত আছে যে, হিন্দু-সঙ্গীত আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারের একটী সুপ্রাচীন গুরুত্ব-পূর্ণ শাখা। এই ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্য আমার নাই। এরূপ কথা বলা কখনই সমীচীন হইবে না। আমাদের সম্মুখে প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থের অনেক নামের তালিকা আছে; কিছু কিছু গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, এইসব গ্রন্থোল্লিখিত তত্ত্বের সঙ্গে বর্ত্তমানে প্রচলিত সঙ্গীতের কোনও সম্পর্ক আছে কি? আমরা এই গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে পারি, তাহার অর্থও বুঝিতে পারি, কিন্তু যদি এইসকল গ্রন্থে প্রতিপন্ন সঙ্গীতের সঙ্গে বর্ত্তমানে প্রচলিত ও গীত সঙ্গীতের কোনও সম্পর্ক না থাকে, অর্থাৎ

ইহারা যদি বিভিন্ন হয়, তবে কষ্ট করিয়া গ্রন্থপাঠের প্রয়োজন কি? অনেক ব্যক্তি আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া কঠিন। আমরা কি বলতে পারি যে, 'রত্নাকর', 'দর্পণ', 'রাগবোধ', 'পারিজাত' ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত সঙ্গীত ঐসকল গ্রন্থে লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমরা গাহিয়া থাকি? গ্রন্থে লিখিত স্বরের ও রাগের নামগুলি (মাত্রা) এখনও প্রচলিত আছে বলিয়া কি আমরা দাবী করিতে পারি যে, আমরা সেই প্রাচীন সঙ্গীত গাহিতেছি? গ্রন্থে রাগের যে, বর্ণনা দেওয়া আছে তার সঙ্গে সেই নামের বর্ত্তমান রাগের রূপের মিল নাই। যদি আমরা গ্রন্থের বর্ণনা বা নির্দ্দেশ অনুসারে রাগগুলি গাহিতে চেষ্টা করি, তবে তাহার কতকগুলি আমাদের অন্তরে আবেদন সৃষ্টি করিবে না, কতকগুলির নূতন নামকরণ করিতে হইবে। এই যদি অবস্থা হয়, তবে গ্রন্থপাঠ কেন করিব এবং যে ব্যক্তি এইসব গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে তাহাকে সঙ্গীততত্ত্ববিষয়ে বিদ্বান্ বলিয়া মনে করিব? বর্ত্তমান সঙ্গীতের পক্ষে এই সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদদের উপযোগিতাই বা কী? এই সকল প্রশ্ন আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। ইহার কী জবাব আমরা দিব? 'রত্নাকরে' যে দশজাতীয় রাগের উল্লেখ আছে নাম ও বিস্তারিত নিয়ম অনুসারে তাহাদের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, কিন্তু এমন একজন সঙ্গীতবিশারদও কি মিলিবে যিনি এইগুলি গাহিতে পারিবেন এবং বর্ত্তমানে প্রচলিত অন্ততঃ কয়েকটী রাগের সহিত তাহাদের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য করিতে পারিবেন? তবে এইসব গ্রন্থের প্রয়োজন কী?

কিছু লোক বরং বলিবেন বর্ত্তমানে যে সঙ্গীত প্রচলিত রহিয়াছে তাহাই স্বতন্ত্রভাবে পর্য্যালোচনা করা হোক। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির যে রূপ গড়িয়া উঠিয়াছে সে বিষয়ে গবেষণা করিয়া আধুনিক রাগ-সঙ্গীতের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিত হোক। আমার মনেও মধ্যে মধ্যে এই চিন্তা উদিত হইত। আমার কয়েকজন বন্ধু প্রস্তাব করিলেন যে, মাদ্রাজ প্রদেশে একবার আমার যাওয়া উচিত। সেখানে গেলে হয়ত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির সমাধান মিলিবে। ওখানে যে সঙ্গীত-চর্চ্চা প্রচলিত আছে তাহা প্রাচীন গ্রন্থ-ভিত্তিক। প্রাচীন রাগের নাম ও নিয়ম বহু পরিমাণে এখনও সেখানে চলিত আছে। অনেক দিন হইতে আমার মনে এই প্রস্তাব রেখাপাত করিয়াছে এবং প্রথম সুযোগেই আমি মাদ্রাজ যাইব স্থির করিয়াছিলাম। সেই সুযোগ এখন আসিয়াছে এবং আমরা মাদ্রাজ রওনা হইতেছি......।

"সঙ্গীতের দিক হইতে যে-সব সহর গুরুত্বপূর্ণ আমি সেই সহরগুলিতে যাইব। সে অঞ্চলের প্রামাণ্য সঙ্গীতশাস্ত্র গ্রন্থগুলি আমি দেখিব এবং তাহাদের সহিত 'রত্নাকর'-এর মত প্রাচীন গ্রন্থের কোনও যোগসূত্র আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিব। যদি আমি ইহা করিতে সক্ষম হই, তবে জানিব যে সঙ্গীতের সার্থক সেবা করিতে পারিয়াছি।"

৪

প্রথমবারের সফরে ভাতখণ্ডে মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, মাদুরা, বাঙ্গালোর, এটায়াপুরম ও মহীশূরে গেলেন। এই সকল স্থানের গায়কদের ও সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদদের সঙ্গে দেখা করিলেন ও সাধারণ গ্রন্থাগারে গেলেন। এটায়াপুরমে তাঁহার সহিত গোবিন্দ দীক্ষিতারের বংশধর সুবরাম দীক্ষিতারের ও 'চতুর্দ্দণ্ডী প্রকাশিকা'র রচয়িতা ভেঙ্কটমাখির সাক্ষাৎ হইল। তিনি সুবরাম দীক্ষিতারের নিকট হইতে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য ও 'চতুর্দ্দণ্ডী প্রকাশিকা'র একটি পাণ্ডুলিপি পাইয়াছিলেন।

তিনি রামামাত্যের 'স্বর-মেলা-কলানিধি', তুলাজেন্দ্রের 'সঙ্গীত সারামৃত' এবং 'রাগ লক্ষণ' নামে আর একখানি পুস্তকের প্রতিলিপি সংগ্রহ করিলেন। শেষোক্ত পুস্তকটী গ্রন্থাগারিকেরা তাঁহার জন্য প্রতিলিপি করাইয়া দিয়াছিলেন। বোম্বাই ফিরিয়া আসিয়া এইসব পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া চারি আনা ও আট আনা মাত্র মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। ভাতখণ্ডেই সর্ব্বপ্রথম উত্তর ভারতের জনসাধারণকে জানান যে, দু'টী বিভিন্ন সঙ্গীত-পদ্ধতি আছে, কর্ণাটকী ও হিন্দুস্থানী, এবং এই দুইটী পদ্ধতির শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের নাম বিভিন্ন। এমন কি দক্ষিণ ভারতেও এই

গ্রন্থগুলি সামান্য পরিচিত ছিল। ভাতখণ্ডের প্রকাশনার পরে এই দিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। মাদ্রাজ মিউজিক একাডেমী এখন এই পুস্তকগুলি সম্পাদনার ও প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করিয়াছে। এই একাডেমী ভাতখণ্ডের প্রকাশনার প্রায় বার বৎসর পরে ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদুরার পরলোকগত শ্রী এম. এস. রামস্বামী আইয়ার ১৯৩২ সালে 'স্বর-মেলা-কলানিধি' সম্পাদনা করেন ও প্রকাশ করেন, অর্থাৎ বোম্বাই সহরে ভাতখণ্ডের প্রকাশনের প্রায় ২০ বৎসর পরে।

ভাতখণ্ডে শ্রীমতী সুখতানকর ও তাঁহার সন্তানদের সহিত দ্বিতীয়বার সফর করেন ১৯০৭ সালে। এবার গেলেন পূর্ব্বদিকে—নাগপুর, কলিকাতা, হায়দরাবাদ (দক্ষিণ) ও বিজয়নগর। কলিকাতায় আসিয়া কয়েকজন সঙ্গীততত্ত্ববিদ্‌দের সহিত আলোচনা করেন। রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিতও তিনি দেখা করেন। উভয়ের মধ্যে আলোচনা ও ভাব-বিনিময় চলিতে চলিতে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। রাজার মৃত্যু পর্য্যন্ত এই বন্ধুত্ব অটুট ছিল। ভাতখণ্ডের প্রাচীন গ্রন্থের গভীর অধ্যয়ন দেখিয়া রাজাসাহেব অতিশয় মুগ্ধ হন। ভাতখণ্ডের সহিত আলাপ-আলোচনার পরে রাজাসাহেবের কয়েকটী বিষয়ে ধারণার পরিবর্ত্তন হয়। পুরাতন গ্রন্থের সঠিক ব্যাখ্যা ভাতখণ্ডের নিকট হইতে শুনিবার ফলে এই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

ইহার পরে তাঁহারা জগন্নাথধাম পুরী তীর্থযাত্রা করেন। পুরী হইতে তাঁহারা বিজয়নগরে যান। এখানে ভাতখণ্ডে মহারাজার গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন ও সঙ্গীত সম্বন্ধে

আগ্রহশীল কয়েকজন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সফরের সর্ব্বশেষে তাঁহারা হায়দরাবাদ যান। এখানে তাঁহার সহিত আপ্পা তুলসী, তানরস খাঁয়ের পরিবারের কয়েকজন পেশাদার গায়ক, গোলাম ঘোরে, উমরাও খাঁ, আব্দুল করিম খাঁ, মহম্মদ সিদ্দিকি ও ধ্রুপদ গায়ক মুরাদ খাঁ-এর সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রচলিত সঙ্গীতরীতির ভিত্তিতে সঙ্গীতের যে তত্ত্ব ভাতখণ্ডে প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার বিবরণ তিনি আপ্পা তুলসীকে জানান। আপ্পা তুলসী তখনই আগ্রহ সহকারে সেই তত্ত্ব গ্রহণ করেন ও মানিয়া নেন। ভাতখণ্ডে যখন তাঁর 'শ্রী মল্লাক্ষ্য সঙ্গীতম' নামে পুস্তক আপ্পা তুলসীর কাছে পাঠান তখন তিনি ভাতখণ্ডের 'লক্ষ্য সঙ্গীতম' পুস্তকে বর্ণিত বিভিন্ন রাগের সংজ্ঞা শ্লোকবদ্ধ করেন। তিনি সংস্কৃতে 'সঙ্গীত-সুধাকর', 'সঙ্গীত কল্পদ্রুমাঙ্কুর' ও 'রাগ চন্দ্রিকা' এবং হিন্দীতে 'রাগ চন্দ্রিকা সার' নামে যে-সব পুস্তিকা রচনা করেন সে-সবের ভিত্তি ছিল ভাতখণ্ডের প্রদত্ত রাগের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা।

১৯০৮-৯ সালে ভাতখণ্ডের শেষ সফর। এবার উত্তরে। জব্বলপুর, এলাহাবাদ, বেনারস, আগ্রা, দিল্লী, মথুরা, জয়পুর, বিকানীর ও উদয়পুরে গেলেন। তিনি এলাহাবাদের পীতমলাল গোঁসাই, মথুরার গণেশীলাল, দিল্লীর পান্নালাল গোস্বামী প্রমুখ সঙ্গীতবিশেষজ্ঞদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং উদয়পুরের জাকিরুদ্দীন খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা আল্লা বন্দে খাঁ প্রমুখ শিল্পীদের সঙ্গীত শুনিলেন। তাঁহাদের আলাপ গাহিবার রীতি ছিল অনন্য। ভাতখণ্ডে ইহার প্রশংসা করিলেন। বাদিলাল শিবরাম কিছুদিন উদয়পুরে জাকিরুদ্দীন খাঁ-এর কাছে শিক্ষা

করিয়াছিলেন। এই দুই ভ্রাতার আলাপ গানের রীতি সম্পর্কে তিনি ভাতখণ্ডের নিকট পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছিলেন। এলাহাবাদে পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ যোশীর সহিত ভাতখণ্ডের দেখা হয়। ইঁহার প্রচেষ্টায় তিনি লোচনের 'রাগ তরঙ্গিণী' নামক পুস্তকের প্রতিলিপি পান।

এইসব সফরের শেষে ভাতখণ্ডে সংগৃহীত তথ্যাদি সুবিন্যস্ত করার কাজ সুরু করিলেন। কিন্তু তিনি হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করিলেন যে, পুরাতন গ্রন্থ পাঠকালে যে-সব সমস্যা দেখা দিয়াছিল, ভরত ও শার্ঙ্গদেব উল্লিখিত প্রাচীনকালের সঙ্গীতের মূলতত্ত্বের সঠিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যে সন্দেহ দেখা দিয়াছিল, তাহার নিরসন হয় নাই। তিনি ভরত ও শার্ঙ্গদেবের গ্রাম-মূর্চ্ছনা-জাতি-রাগ-এর সহিত পরবর্ত্তীকালের রাগ-রাগিণী বা মেল-রাগ-পদ্ধতির কিছু যোগসূত্র বাহির করিতে উৎসুক ছিলেন। এটায়াপুরমের সুব্বরাম দীক্ষিতারের সহিত আলোচনা-কালে এই যোগসূত্র আবিষ্কারের কিছু সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু এই আশা শেষ পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বস্তুতঃপক্ষে সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি এমন কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পান নাই যিনি এই সমস্যার উপরে আলোকপাত করিতে পারেন। বিভিন্ন সফরের সময়ে সর্ব্বদা তাঁহার নিকট এ-বিষয়ে বিস্তারিত প্রশ্নাবলী থাকিত। যে-সব সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীততত্ত্ববিশারদদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত তাঁহাদের সহিত ভাতখণ্ডে এ-বিষয়ে আলোচনা করিতেন।

'রত্নাকর'-পূর্ব যুগের সঙ্গীতপদ্ধতির সঙ্গে পরবর্ত্তী যুগের সঙ্গীতপদ্ধতির যোগসূত্র আবিষ্কারের সকল আশা ত্যাগ

করিয়া তিনি তাঁর সমকালে প্রচলিত সঙ্গীতকে পুনর্গঠন বা পুনর্বিন্যাসের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার এই কাজের ভিত্তি হইল 'লক্ষ্য' এবং তাহার ব্যবহারিক রূপ অর্থাৎ বিখ্যাত শিল্পীদের প্রচলিত প্রথানুযায়ী রাগসঙ্গীত রচনা ও তানকর্ত্তবসহ তাহার গায়ন ও আদায়। তিনি সারাজীবন ধরিয়া যেখান হইতে পারিয়াছেন পুরাতন সঙ্গীতরচনা সংগ্রহ করিয়াছেন। সফর হইতে ফিরিবার পর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত শ্লোকবদ্ধ 'লক্ষ্য সঙ্গীত' ও মারাঠী ভাষায় রচিত 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি'র প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। ১৯১০ সালে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে আইনব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া বাকি জীবন সঙ্গীতের সেবায় নিয়োগ করিলেন। আইন-ব্যবসায় হইতে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। নিজের জীবনধারণের জন্য কাহারও নিকট হইতে অর্থসাহায্যের প্রয়োজন ছিল না।

এই বৎসর তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। তখন আমি দু'-বৎসর হোন্নাওয়ার কৃষ্ণম ভাটের নিকট ও কয়েক মাস শ্রীঅনন্তমনোহর যোশীর (অন্ত বুওয়া) নিকট সঙ্গীত শিখিয়া কয়েকটী রাগে খেয়াল ও ধ্রুপদ মোটামুটি ভালভাবেই গাহিতে পারিতাম। আমার পিতার ও ভাতখণ্ডের বন্ধু শ্রীশঙ্কররাও করনাদ আমার গান শুনিয়া আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৯০৯ সালে একদিন আমি যখন অনন্তমনোহর যোশীর নির্দ্দেশানুসারে সঙ্গীত অভ্যাস করিতেছিলাম তখন শ্রীশঙ্কররাও করনাদ একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া আমার পিতার সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। দীর্ঘদেহ,

গৌরবর্ণ, উজ্জ্বল-চোখ এই ভদ্রলোকের পরণে ছিল সাদা প্যাণ্ট, আলপাকার কোট ও মাথায় পুণার অধিবাসীদের ধরণে লাল পাগড়ী। কোটের একটীমাত্র বোতাম লাগানো ছিল, ফলে কোটের নিচের ওয়েষ্টকোটও দেখা যাইতেছিল। তিনি কয়েকটী গান বাছিয়া দিয়া সেইগুলি গাহিতে বলিলেন। শেষে তিনি আমাকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ১২টী স্বর অর্থাৎ মা, কোমল রে, শুদ্ধ রে, কোমল গা, শুদ্ধ গা ইত্যাদি পর পর না থামিয়া গাহিতে বলিলেন। আমি কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম জানি না, কিন্তু সেই আগন্তুক ভদ্রলোক আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "ভালই করিয়াছ, সাধনা করিয়া যাও, একদিন ভাল সঙ্গীতজ্ঞ হইতে পারিবে।" তিনি আমাকে কিছু মিষ্টি খাইতে দিলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর আমার পিতা আমাকে বলিলেন, "ইনি বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে।" ইহার ছয়মাস পরে ভাতখণ্ডের 'শ্রী মল্লাক্ষ্য সঙ্গীতম' ও 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি'র একটি করিয়া কপি আমার পিতাকে ডাকযোগে পাঠাইয়া দেন। আমার পিতা সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন এবং সেতার বাদনেও দক্ষ ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই সঙ্গীত সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ তথ্যসম্বলিত পুস্তকের অনুসন্ধান করিতেন। তিনি এই পুস্তক দুইখানি মনোযোগ দিয়া পড়িলেন। ইহার যুক্তিপূর্ণ ও উপযুক্ত বিচারপদ্ধতি তাঁহার ভাল লাগিল। পরে তিনি প্রায়ই এই পুস্তক দুইটী বিশেষ-ভাবে পড়িতেন।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সহিত আমার আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

হইল এক বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে। ১৯১০ সালে আমার পিতা চাকুরী হইতে অবসর লইলেন। আমরা সকলে পুণায় বাস করিতে আসিলাম। কিন্তু মাতার অসুস্থতার জন্য ১৯১১ সালের প্রথম দিকে আবার আমাদের বোম্বাই যাইতে হইল। একদিন হঠাৎ ভাতখণ্ডেজীর সহিত আমার পিতার ট্রামে সাক্ষাৎ হইল। তিনি পিতাকে আমার সঙ্গীতচর্চ্চার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা জানাইলেন যে, যদিও আমার সঙ্গীতানুরাগ আগের মতই আছে কিন্তু অর্থের অসচ্ছলতার জন্য এখন শিক্ষা বন্ধ রহিয়াছে। ভাতখণ্ডেজী আমাকে তাঁহার গৃহে লইয়া যাইতে বলিলেন এবং কথা দিলেন যে, আমার সঙ্গীতশিক্ষা বিষয়ে তিনি দেখাশুনা করিবেন।

১৯১১ সালের নভেম্বর মাসে আমার পিতা আমাকে তাঁহার বাড়িতে লইয়া যান। সেই হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার সহিত তাঁহার সম্পর্ক দিন দিন অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি আমাকে সঙ্গীত শিক্ষা করিবার জন্য প্রতি সন্ধ্যায় গায়ন উত্তেজকমণ্ডলীতে আসিতে বলিলেন। তখন আমি ছোট ছিলাম বলিয়া একলা যাইতে পারিতাম না, বাবা আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। পিছনের একটী ঘরে বসিয়া ভাতখণ্ডেজী নিজে আমাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। পিতা আমাকে একটী নূতন তম্বুরা ও একজোড়া তবলা কিনিয়া দিলেন। গৃহে আমি প্রত্যহ তিন চার ঘণ্টা করিয়া রেওয়াজ করিতে লাগিলাম। পিতার নানা ঝঞ্ঝাট সত্ত্বেও তিনি আমাকে একলা ছাড়িয়া দিতেন না। নিয়মিত সঙ্গীতচর্চ্চা যাহাতে অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতেন। ১৯১২ সালের

সেপ্টেম্বর মাসে আমার মাতার মৃত্যু হয় এবং আমরা বান্দ্রায় চলিয়া যাই। কিন্তু আমার পিতা আমাকে নিয়মিত মণ্ডলীতে লইয়া যাইতেন।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রথমে রাগটীর রূপরেখা বুঝাইয়া দিতেন। তাহার পর সেই রাগের 'নোম তোম' (আলাপ) শিখাইতেন। এই শিক্ষায় তিনি যখন সন্তুষ্ট হইতেন তখন রাগের সবিস্তার শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিতেন। মণ্ডলীর বন্ধুরা সকলে তাঁহাকে 'রাও সাহেব' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। নাজির খাঁ প্রভৃতি অন্যান্য ওস্তাদেরাও তাঁহাকে ঐ নামেই ডাকিতেন। অতএব আমি, আমার পিতা, বাদিলালজী ও শঙ্কররাও করনাদ সকলে তাঁহাকে রাও সাহেব বলিয়াই উল্লেখ করিতাম।

তিনি তখন 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি'র অন্যান্য খণ্ডগুলি লিখিতে ও 'সঙ্গীত রত্নাকর', 'সঙ্গীত দর্পণ', 'রাগ বিবোধ' ও 'সঙ্গীত পারিজাত' ইত্যাদি পুস্তকগুলির স্বরাধ্যায় সম্পাদনা করিতেছিলেন। এই সময়ে সফর হইতে প্রাপ্ত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সঙ্গীত পুস্তিকাগুলিও প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৯১৪ সালের মধ্যে 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি'-র ২য় ও ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৯১১ সালে তিনি তাঁহার 'লক্ষণ গীত' প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে আরোহ, অবরোহ, বাদী, সম্বাদীর নিয়ম, ভিন্ন ভিন্ন রাগের সময় ও স্বরসঙ্গতি লিখিত হইয়াছিল। এগুলির বেশীর ভাগ পুরাতন ঘরানা সঙ্গীতের যুগলবন্দী ছিল (একই রাগে অথবা তৎসদৃশ রাগে নিবদ্ধ দুটী গান)। কল্যাণ ঠাট, বিলাওল ঠাট ও খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত সব রাগগুলির লক্ষণগীত এই পুস্তকে দেওয়া

হইয়াছিল। জনপ্রিয় রাগের প্রায় একশত তালবদ্ধ স্বরমালিকা ও সরগম সম্বলিত একটী পুস্তিকাও এই বৎসর প্রকাশ করেন।

মারাঠী ভাষায় লিখিত 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি'র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ১৩৫ পৃষ্ঠায় ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরগ্রাম, স্বর ও শ্রুতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা ছিল। তৎকালে যে-সব স্বর ও শ্রুতিবিষয়ক উপপত্তি প্রাচীন সঙ্গীততত্ত্ববিদদের তত্ত্ব বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহার অসঙ্গতির যুক্তিসিদ্ধ বিশ্লেষণই ইহাতে করা হইয়াছে। পরে ১৯১৬ সালে বরোদায় অনুষ্ঠিত প্রথম নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে এই উপপত্তিগুলিকে বাতিল করা হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত তাঁহার আলোচনাগুলি যুক্তি, তর্ক ও সরস মন্তব্যে পূর্ণ এবং সুখপাঠ্য ছিল। 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি'-র প্রথম খণ্ডে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সাধারণ মূল তত্ত্ব এবং কল্যাণ, বিলাওল ও খাম্বাজ ঠাটের সমস্ত রাগগুলির বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া ছিল। তৃতীয় খণ্ডে পূরবী ও মাড়োয়া ঠাটের সমস্ত রাগগুলির অনুরূপ ব্যাখ্যা ছিল। এই সমস্ত রাগের কালক্রমের (যতটুকু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়), নামের, কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের বিবিধ পরিবর্ত্তনের ও বিভিন্ন সময়ে সংযোজনের ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। উপরন্তু প্রতি রাগের পরম্পরাগত পটভূমিকা, বর্ত্তমান রূপ এবং তাহার সমর্থনে প্রাপ্ত সংস্কৃত শ্লোক বিবৃত করা হইয়াছিল। পরিশেষে উহাদের স্থায়ী ও অন্তরার আলাপ ও প্রামাণ্যপরম্পরাগত কয়েকটী রচনার স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছিল। এই পদ্ধতি ছিল নূতন ও অভিনব, কিন্তু ইহার দ্বারা বিষয়টী খুব আলোকপ্রদ এবং

শিক্ষাপ্রদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই পুস্তকগুলি প্রকাশ করিয়া ভাতখণ্ডেজী সঙ্গীতানুরাগী উৎসাহী বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করেন। ইহা হইতে কোনও অর্থ উপার্জ্জনের অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। এই পুস্তক অল্প সংখ্যায় ছাপা হয়। মারাঠী ভাষায় লিখিত বলিয়া মারাঠী ভাষা জানা সমস্ত সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতশাস্ত্রীদের হাতে এই পুস্তক পেঁাছাইল। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাতখণ্ডেজী হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পরম পণ্ডিত ও প্রামাণ্য তত্ত্ববিদ হিসাবে সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইলেন। তাঁহার নাম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ১৯১৫ সালে তিনি পরম্পরাগত 'গীত মালিকা' নামে পুরাতন সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রতি মাসে মাত্র চার আনা দামে প্রকাশ করিতে সুরু করেন। প্রতি সংখ্যায় প্রায় পঁচিশটী ধ্রুপদ, খেয়াল, সাদরা, হোরি, তারাণা ও ভজনের স্বরলিপি থাকিত। মোট প্রায় ২৩টী এইরূপ পুস্তিকা প্রকাশিত হয় বোম্বাই-এর 'মুম্বাই সমাচার প্রেস' হইতে। এই পুস্তিকাগুলি খুব জনপ্রিয় হয় এবং ইহাদের চাহিদাও খুব বেশী হয়। এই সময়ে 'হৃদয় কৌতুক' ও 'হৃদয় প্রকাশে'র ধরণে তিনি সংস্কৃতে 'অভিনব রাগ-মঞ্জরী' নামে একটী পুস্তক লেখেন। এই পুস্তকে দ্বিপদী শ্লোকে তিনি রাগের সংজ্ঞা বর্ণনা করেন।

৫

প্রচলিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভিত্তিতে ভাতখণ্ডেজী সঙ্গীতের যে তত্ত্ববিন্যাস করেন নিম্নে তাহার প্রধান বিষয়গুলি দেওয়া হইল :—

১। ভারতীয় স্বর সপ্তক ২২টী শ্রুতি লইয়া গঠিত। এই শ্রুতির একের হইতে অপরের দূরত্ব অতি সূক্ষ্ম হইলেও মনোযোগসহকারে শুনিলে সে দূরত্ব বা পরস্পরের পার্থক্য বোঝা যায়।

২। এই ২২টী শ্রুতির মধ্যে ১২টী অর্থাৎ ১, ৩, ৫, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ১৯ ও ২১ নম্বর শ্রুতিগুলি স্বর নামে পরিচিত এবং রাগ সৃষ্টি করিবার জন্য এইগুলি বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। এই স্বরের একটী হইতে অপরটীর দূরত্ব প্রায় অর্দ্ধস্বর (**semitone**)। স্বরগুলির নাম ষড়জ, কোমল ঋষভ, শুদ্ধ ঋষভ, কোমল গান্ধার, শুদ্ধ গান্ধার, শুদ্ধ মধ্যম, কড়ি বা তীব্র মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধৈবত, শুদ্ধ ধৈবত, কোমল নিষাদ, ও শুদ্ধ নিষাদ। এগুলি লিখিবার ও গাহিবার সময় সংক্ষিপ্ত সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি নামে অভিহিত হয়।

৩। ভাতখণ্ডেজীর স্বরলিপিতে কোমল রে গা ধা নি নীচে মাত্রা দিয়া অর্থাৎ রে̱ গা̱ ধা̱ নি̱ ও কড়ি মা উপরে লম্বা দাগ দিয়া অর্থাৎ মা̍ চিহ্নিত করা হইয়াছে। তিনটী সপ্তককে মন্দ্র

বা উদারা (নিম্ন), মধ্য বা মুদারা (স্বাভাবিক), তীব্র বা তারা (উচ্চ) নামে অভিহিত করা হয়। উদারার স্বরগুলির নীচে একটী বিন্দু দিয়া যথা নি ধা পা মা এইভাবে ও তারার স্বর

গুলির উপরে যথা সা রে গা মা এইভাবে বিন্দু দিয়া বুঝানো হইয়া থাকে।

৪। একটী বাদ্যরত তারের উপর এই ১২টী অর্দ্ধ স্বরের অবস্থান নিম্নলিখিত রূপ :—

সা	দুইটী ব্রিজের (সওয়াবি) মধ্যে অবস্থিত বাদ্যবত তারের পূর্ণ দৈর্ঘ্য।	
রে (কোমল)	১৫।১৬	
রে (শুদ্ধ)	৮।৯	
গা (কোমল)	৫।৬	
গা (শুদ্ধ)	৪।৫	আনুমানিক (approximately)
মা (শুদ্ধ)	৩।৪	
মা (তীব্র)	১৭।২৪	
পা	২।৩	
ধা (কোমল)	৫।৮	
ধা (শুদ্ধ)	১৬।২৭	
নি (কোমল)	৫।৯	
নি (শুদ্ধ)	৮।১৫	আনুমানিক (approximately)
সা (তার সপ্তক)	১।২	

৫। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগগুলি দশটী ঠাটে বা জনক মেলায় বিভক্ত :—

(ক) বিলাওল ঠাট—সা রে গা মা পা ধা নি সা।

(খ) কল্যাণ বা ইমন ঠাট—সা রে গা মা পা ধা নি সা।

(গ) খাম্বাজ ঠাট—সা রে গা মা পা ধা নি সা।

(ঘ) ভৈরব ঠাট—সা রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।

(ঙ) পূরবী ঠাট—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।

(চ) মাড়োয়া ঠাট—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।

(ছ) কাফি ঠাট—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।

(জ) আশাবরী ঠাট—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।

(ঝ) ভৈরবী ঠাট—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।

(ঞ) তোড়ী ঠাট—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।

৬। এই ঠাট হইতে ভিন্ন ভিন্ন রাগের সৃষ্টি হইয়াছিল, যেমন (১) পুরা ঠাটকেই একটী রাগ বলিয়া মানা। (২) সা ব্যতীত আরোহ বা অবরোহে বা উভয় সময়ে একটী বা দু'টী স্বর বর্জ্জন করিয়া সম্পূর্ণ, ষাড়ব (ছয় স্বরযুক্ত) ও ওড়ব

(পাঁচ স্বরযুক্ত) রাগ সৃষ্টি করা। (৩-ক) পূর্ব্বাঙ্গে (সা, রে, গা, মা, পা-এর মধ্যে) অথবা উত্তরাঙ্গে (সা, নি, ধা, পা, মা-এর মধ্যে) একটী স্বরকে প্রাধান্য দেওয়া। এই স্বরকে ঐ রাগের বাদী (প্রধান ও প্রকাশব্যঞ্জক) স্বর বলা হয়। (৩-খ) সপ্তকের যে অর্দ্ধাঙ্গে বাদী স্বর অবস্থিত উহার অপর অর্দ্ধাঙ্গের অন্য একটী স্বরকে প্রাধান্য দেওয়া। এই স্বরটীকে সম্বাদী স্বর (বাদী স্বরের প্রতিনিধি ও সহায়ক) বলা হয়। সম্বাদী স্বর সাধারণতঃ বাদী স্বরেব সহায়তাকারক প্রধান স্বর। কিন্তু যদি সেই রাগে এই স্বর বর্জ্জিত হয়, তবে বাদীর পরবর্ত্তী দ্বিতীয় প্রধান স্বর সম্বাদীর কাজ করে।

৭। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগ গাহিবার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। কোনও রাগ সকালে, কোনও রাগ দ্বিপ্রহরে, কোনও রাগ সন্ধ্যাকালে ও কোনও রাগ রাত্রে গাওয়া হয়। রাগের সঙ্গঠক স্বর ও বাদী ও সম্বাদী স্বর অনুযায়ী এই সময় নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। যে রাগে কোমল রে ও কোমল ধা আছে, সেগুলি প্রত্যূযে ও গোধূলিবেলায় গীত হয়। যে-সকল রাগে শুদ্ধ রে, শুদ্ধ গা ও শুদ্ধ ধা আছে, সেগুলি প্রত্যূষের পরে সকালে ও গোধুলির পরে সন্ধ্যায় গাওয়া হয়। যে রাগগুলিতে কোমল গা ও কোমল নি আছে, সেগুলি দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ও শেষ রাত্রি হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত গাওয়া হয়। মধ্যাহ্ন হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত যে-সকল রাগ গাওয়া হয় তাহাদের বাদী স্বর পূর্ব্বাঙ্গে থাকে এবং সেইজন্য এগুলিকে পূর্ব্বরাগ বলা হয়। মধ্যরাত্রি হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত গীত রাগগুলির

বাদী স্বর উত্তরাঙ্গে থাকে বলিয়া সেগুলিকে উত্তররাগ বলা হয়।

৮। প্রত্যেক রাগের একটী বিশিষ্ট স্বরপ্রয়োগরীতি আছে, যাহার দ্বারা ঐ রাগের অনুরূপ প্রকৃতির অন্য রাগ হইতে ইহাকে পৃথক করা যায়। এই স্বরবিন্যাসকে 'পকড়' (পরিচায়ক স্বরসমুদয়) বলা হয়।

৯। গাণিতিক পদ্ধতিতে অনেক রাগের সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু রাগের প্রধান গুণ রঞ্জকতা অর্থাৎ রাগ শুনিতে মধুর হওয়া চাই এবং তাহার বিস্তারের মধ্য দিয়া একটী সঙ্গীতময় রূপ বা চিত্রের ব্যঞ্জনা ফুটিয়া ওঠা চাই। এই কারণে গাহিবার উপযুক্ত রাগের সংখ্যা সীমিত। ১৫০টীর বেশী রাগ প্রচলিত নাই। ইহার মধ্যে আবার ৭৫টী হইতে ১০০টী রাগ মাত্র সাধারণতঃ জানা এবং শোনা যায়।

রাগগুলিকে আবার রাগাঙ্গতে বিভক্ত করা হইয়াছে অর্থাৎ বিশেষ একটী রাগের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত রাগকে রাগাঙ্গ বলা হয়। যেমন কানাড়া-অঙ্গ, মল্লার-অঙ্গ, সারঙ্গ-অঙ্গ, কল্যাণ-অঙ্গ, বিলাওল-অঙ্গ, ভৈরব-অঙ্গ, শ্রী-অঙ্গ ইত্যাদি। এই রাগগুলিকে কানাড়া, মল্লার, সারঙ্গ, কল্যাণ, বিলাওল, ভৈরব ইত্যাদি রাগের এক-একটী বিভিন্ন রূপ বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে।

পেশাদার ওস্তাদগণ গাহিবার কায়দার প্রদর্শক মাত্র। তাঁহারা গান করিয়া শুনাইতেন এবং তাঁহাদের গান হইতে সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক বা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও পদ্ধতি-বিন্যাস সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করা সম্ভব ছিল ভাতখণ্ডেজী তাহা সুষ্ঠুভাবে

করিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যার সাহায্যে সঙ্গীতের মাধুর্য্য ও নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের ভাবনাগত দিকটাও শ্রোতাদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইল।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডের লিখিত পুস্তকের দ্বারা তাৎকালীন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতি একটা সুবিন্যস্ত রূপ পাইল। সঙ্গীত বিষয়ে আগ্রহান্বিত ব্যক্তিরা সমকালীন সঙ্গীতের শাস্ত্র সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করিতে সুরু করিলেন। ভাতখণ্ডেজীর খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। বরোদার মহারাজা সয়াজী-রাও গায়কোয়াড়, গোয়ালিয়রের মহারাজা মাধবরাও সিন্ধিয়া, রামপুরের নবাব হামিদ আলি প্রমুখ সঙ্গীতপ্রেমিক রাজন্যবর্গ ভাতখণ্ডের কার্য্যে উৎসাহী হইয়া উঠিলেন।

বরোদার রাজসরকার মৌলা বক্স গিস্সে খাঁ নামক একজন ওস্তাদের তত্ত্বাবধানে একটা সঙ্গীত বিদ্যালয় চালাইতেছিল। তিনি দক্ষিণ ভারতের লোক ছিলেন বলিয়া হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ছাড়া কিছু কিছু কর্ণাটকী সঙ্গীতও জানিতেন। তিনি ছিলেন উদার ও প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন। তিনি সম্ভবতঃ আসরের গায়ক ছিলেন না, কিন্তু যোগ্যতার সহিত সঙ্গীতশিক্ষা পরিচালনা করিতে পারিতেন। তিনি তাঁহার নিজস্ব স্বরলিপি পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রচলন এবং কয়েকটা সঙ্গীত রচনাও প্রকাশ করেন। বরোদায় তাঁহার পদ্ধতির অনুরাগী কিছু লোক ছিল। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন বরোদার রাজকীয় সঙ্গীত বিদ্যালয় ভালই চলিতেছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর বিদ্যালয়টার অবনতি হয়। বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মহারাজা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি

একজন বিশেষজ্ঞের সন্ধান করিতে লাগিলেন যিনি এই বিদ্যালয়টীর উন্নতির পথ দেখাইতে পারেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভাতখণ্ডের কৃতির কথা তিনি শুনিয়াছিলেন। মহারাজা তাঁহাকে বরোদায় আমন্ত্রণ করিলেন। ১৯১৫ সালে ভাতখণ্ডে বরোদায় যান এবং মহারাজার সহিত তাঁহার কয়েকবার সাক্ষাৎকার হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে মহারাজা জানিতে চান হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কোনও তত্ত্ব বা থিয়োরী, শিক্ষাদান পদ্ধতি, স্বরলিপির নিয়মাবলী ও ক্রমিক পাঠ্য পুস্তক আছে কিনা। এ বিষয়ে যতদূর কাজ হইয়াছে ভাতখণ্ডে তাহা জানান এবং বলেন যে, সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে রাগের প্রচলিত রূপ ও তাহাদের পরম্পরাগত রচনা বিষয়ে একটী সাধারণ মতৈক্য না হইলে সমসাময়িক সঙ্গীতের প্রামাণ্য তত্ত্ব গড়িয়া তোলা যাইবে না। এত মতভেদ আছে এবং এত বিভিন্ন ঘরানা আছে জানিয়া মহারাজা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। এ বিষয়ে কোনও মীমাংসা করা সম্ভব কিনা তিনি জানিতে চাহিলেন এবং নিজেই বলিলেন, "মিঃ ভাতখণ্ডে, যদি আমরা ভারতের সকল সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞদের একটী সভায় মিলিত হইয়া সঙ্গীতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিয়া একটী বোঝাপড়া করিবার জন্য বরোদায় আমন্ত্রণ করি তাহা হইলে সঙ্গীতের তত্ত্ব ও তাহার ব্যবহারিক রূপের মান-নির্ণয় সম্ভব হইবে কি?" বস্তুতঃপক্ষে সুদক্ষ আইনজীবী ভাতখণ্ডে মহাবাজার মনে সর্ব্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনের চিন্তা এইভাবে জাগাইয়া দিলেন। ভাতখণ্ডে স্বয়ং বহুদিন হইতে এইরূপ একটী সম্মেলনের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। সুতরাং

তিনি মহারাজাকে বুঝাইলেন যে, ইহার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হইতে পারে না। ইহার দ্বারা ভারতের সঙ্গীতের অতুলনীয় সেবা করা হইবে। সয়াজীরাও তাঁহাকে এইরূপ একটী সম্মেলনের খসড়া এবং যে-সব সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত-শাস্ত্রীদের আমন্ত্রণ করা হইবে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিতে বলিলেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের খসড়া, নিমন্ত্রিতদের তালিকা ও সভার বিশদ কার্য্যতালিকা প্রস্তুত করিয়া বরোদায় পাঠাইয়া দিলেন। এইভাবে ১৯১৬ সালে বরোদা রাজ্যের বরোদা কলেজের সেনট্রাল হলে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। দক্ষিণ ভারতীয় ও ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে আগত সঙ্গীত-শাস্ত্রিগণ এই অধিবেশনে সঙ্গীতের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। মিঃ কে. বি. দেবল এবং মিঃ ই. ক্লিমেণ্টস্, আই. সি. এস. তাঁহাদের প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তাঁহাদের রচনার মূলকথা হইল যে, প্রাচীন সঙ্গীততত্ত্ববিদগণ যাহাকে চার শ্রুতি, তিন শ্রুতি ও দুই শ্রুতির অন্তরাল বলিয়াছেন তাহাই বর্ত্তমানের মেজর টোন, মাইনর টোন ও সেমিটোন। অতএব শুদ্ধ ঋষভ ও শুদ্ধ ধৈবত,—যাহারা প্রাচীনদের নিয়ম অনুসারে যথাক্রমে সা ও মা হইতে তিন শ্রুতির অন্তরে অবস্থিত, তাহারা মাইনর টোন। সুতরাং শুদ্ধ ঋষভকে সা হইতে একশ্রুতি নীচে অর্থাৎ ১০।৯ (মাইনর টোন) মানিতে হইবে। সেইরূপ শুদ্ধ ধৈবতকে পঞ্চমের ৯।৮ না মানিয়া একশ্রুতি নীচে মানিতে হইবে। অনেক সঙ্গীততত্ত্ববিদ এই প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করিলেন।

ইঁহাদের মধ্যে বিদ্বান সুবরাম পণ্ডিতার ছিলেন। এই প্রস্তাব পরীক্ষা করিয়া দেখা হইল। মিঃ ই. ক্লিমেণ্টস্ তাঁহার শ্রুতি হারমোনিয়ামে বাজাইলেন ও অপর দিকে বিখ্যাত ওস্তাদ উদয়পুরের জাকিরুদ্দীন খাঁ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের শুদ্ধ ঋষভের সঠিক স্থানে সুর তুলিয়া দেখাইলেন। শেষ পর্য্যন্ত মিঃ ক্লিমেণ্টস্ ও মিঃ দেবলের তত্ত্ব গৃহীত হইল না। বরোদা কলেজে দিনের বেলা এইসব আলোচনা ও বিতর্ক হইত এবং পরে বরোদার লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদের দরবার কক্ষে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য কর্ত্তৃক প্রেরিত খ্যাতনামা ওস্তাদগণের গীতবাদ্যের আসর বসিত। লক্ষ্ণৌ-এর ঠাকুর (পরে রাজা নামে খ্যাত) নবাব আলি খাঁ এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের এক স্থায়ী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইল। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে হইলেন তাহার সাধারণ সম্পাদক।[১]

১ বরোদায় অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে ভাতখণ্ডে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটীর নাম 'উত্তর ভারতের সঙ্গীতের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পর্য্যবেক্ষণ'। ইহা পরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহা এখনও পাওয়া যায়।

৬

আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাসে প্রথম নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন একটী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইহার পরে মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বহু সঙ্গীত সম্মেলন হইতে থাকে। পরবর্ত্তীকালে ভাতখণ্ডের মৃত্যুর বহুদিন পরে সঙ্গীত সম্মেলনগুলির মান নামিয়া গিয়াছে। এখন সঙ্গীত সম্মেলনগুলি মেলা বা উৎসবের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গীত সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

নাজির খাঁ-এর মৃত্যুর পর বালকৃষ্ণ বুয়ার এক শিষ্য মিঃ গণপতরাও ভীলাওয়াদিকর গায়ন উত্তেজকমণ্ডলীতে নিযুক্ত হন। পণ্ডিতজীর পরামর্শ অনুসারে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সঙ্গীত একটী শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে গৃহীত হইল। কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞকে শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল। বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটী এই সঙ্গীত শিক্ষকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ভাতখণ্ডেকে অনুরোধ করিলেন। গায়ন উত্তেজকমণ্ডলীতে এইসব শিক্ষকদিগের শিক্ষণকার্য্য চলিতে লাগিল। ১৯১৭ সালে এই মণ্ডলীর নূতন কর্ম্মকর্ত্তাদের সহিত তাঁহার মতানৈক্য হওয়াতে তিনি সদস্যপদ ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার সহিত আরও কয়েকজন মণ্ডলী ত্যাগ করিলেন। ইঁহারা নূতন মণ্ডলী গড়িলেন। এই মণ্ডলীর নাম দিলেন 'শারদা সঙ্গীত মণ্ডল'। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে এই মণ্ডলে যোগদান করিয়া এখানকার সঙ্গীত শিক্ষার ভার অর্পণ করিতে অনুরোধ করা হইল। মিঃ বাদিলালও এই মণ্ডলে যোগদান করিলেন এবং ভাতখণ্ডের কাজে সাহায্য করিতে লাগিলেন।[১]

এইসময় পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সহিত মিঃ ডি. কে. যোশীর পরিচয় হইল। তিনি ভাতখণ্ডের লিখিত পুস্তকগুলি পড়িয়াছিলেন এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভাতখণ্ডের অবদান তাঁহার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। তিনি ভাতখণ্ডের সহিত চিঠিপত্র আদানপ্রদান করিতে লাগিলেন। ফলে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইল। অবশেষে মিঃ যোশী ভাতখণ্ডের স্থায়ী অনুরাগী হইয়া উঠিলেন এবং যথাশক্তি তাঁহার কাজে সকল ভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। এমনকি পুনা হইতে মুদ্রিত 'ক্রমিক পুস্তক মালিকা' ও অন্যান্য পুস্তকের প্রুফ দেখা, ছাপা ইত্যাদি বিষয়ে দেখাশোনা করিতেন। পরবর্তী মিউজিক কনফারেন্সগুলির সকল অধিবেশনে যোগদান করিতেন এবং পণ্ডিতজীর সহকারী হইয়া কঠিন পরিশ্রম করিয়া কনফারেন্সগুলিকে সফল করিয়া তুলিতেন।

রাজা নবাব আলি নিজেকে ভাতখণ্ডের সহযোগী মনে করিতেন। তিনি বাল্যবয়স হইতেই সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। তিনি উত্তরপ্রদেশের আকবরপুরের তালুকদার

১ বোম্বাই-এর ফ্লোরা ফাউণ্টেনের নিকট 'গুড লাইফ লীগ' নামক সংস্থার গৃহে এই ক্লাশ বসিত।

ছিলেন। তাঁহার একজন পেশাদার গায়ক ছিলেন। ইঁহার নাম নাজির খাঁ, যিনি "কালে নাজির খাঁ" নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভাতখণ্ডের কার্য্যকলাপের সংবাদ শুনিয়া নবাব আলি কালে নাজির খাঁকে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ বিবরণ আনিবার জন্য বোম্বাই প্রেরণ করিলেন। ইনি কিছুদিন বোম্বাই-এ থাকিলেন। ভাতখণ্ডে সঙ্গীতের যে মূল-তত্ত্ব প্রণয়ন করিয়াছেন, ইঁহার নিকটে তাহার রূপরেখা ব্যাখ্যা করিলেন ও ইঁহাকে নিজ সংগ্রহ হইতে কয়েকটী পরম্পরাগত গীত শুনাইলেন এবং নাজির খাঁ-এর নিকট হইতেও এইরূপ কয়েকটী গীত সংগ্রহ করিলেন। কালে নাজির খাঁ ভাতখণ্ডের নিকট কয়েকটী 'লক্ষণ গীত' শিখিয়া লইলেন এবং লক্ষ্ণৌ ফিরিয়া গিয়া নিজের শিষ্যবর্গকে শিখাইলেন। তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে ভাতখণ্ডের গভীর অধ্যয়ন ও সুপরিকল্পিত কার্য্যক্রম দেখিয়া খুব প্রভাবিত হইলেন এবং রাজা নবাব আলির নিকট ভাতখণ্ডের প্রতি তাঁহার প্রশংসাসূচক মনোভাব সবিস্তারে ব্যক্ত করিলেন। নবাব আলি ভাতখণ্ডের সহিত নিয়মিত পত্রালাপ করিয়া আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহার বিচার ও তত্ত্বের সহিত ভালভাবে পরিচিত হইলেন। নবাব আলি 'সরিফ-উন-নাঘাম্‌ত' নামে কয়েক খণ্ড সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তক উর্দ্দু ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে তিনি ভাতখণ্ডের সঙ্গীততত্ত্বের রূপরেখা বর্ণনা করেন। তাঁহার পুস্তকাবলীতে অন্যান্য সঙ্গীত রচনার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি ভাতখণ্ডের লক্ষণ সঙ্গীতও সন্নিবিষ্ট করেন। তিনি নিজে একজন সুদক্ষ হার্মোনিয়াম-বাদক ছিলেন।

গোয়ালিয়র রাজ্যের প্রসিদ্ধ হার্মোনিয়াম-বাদক পরলোকগত গণপতরাও ভাইয়া শেষ জীবনে মাঝে মাঝে লক্ষ্ণৌ আসিতেন। সম্ভবতঃ স্কুলজীবনেই নবাব আলি ইঁহার নিকট হইতে হার্মোনিয়াম বাজনা শিখিয়াছিলেন। নবাব আলি পরম্পরাগত সঙ্গীতও খুব চিত্তাকর্ষকভাবে গাহিতে পারিতেন। কেবল পত্রালাপে সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি নিজে ১৯১২ সালে ভাতখণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বোম্বাই-এ আসিলেন। তাহার পর হইতে নবাব আলি তাঁহার একান্ত গুণমুগ্ধ বন্ধু হইয়া উঠিলেন। গোয়ালিয়রের মহারাজা মাধবরাও সিন্ধিয়া প্রায়ই বোম্বাই-এ যাইতেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সঙ্গীতবিষয়ক প্রচেষ্টার কথা শুনিয়া মহারাজা যখন ১৯১৭ সালে বোম্বাই-এ যান তখন ভাতখণ্ডেকে আমন্ত্রণ করিলেন। মহারাজা তাঁহার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বিষয়ে নানা প্রশ্ন আলোচনা করেন এবং ভাতখণ্ডে তাঁহার কার্য্যের ধারা মহারাজাকে ব্যাখ্যা করিয়া শোনান। ইহা শুনিয়া মহারাজা আগ্রহান্বিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সঙ্গীতের এইসব তত্ত্বকে কিভাবে তিনি বাস্তব রূপ দিতেছেন। তখন ভাতখণ্ডের অনুরোধে মহারাজা ভাতখণ্ডের পরিচালিত সঙ্গীত শিক্ষার ক্লাশ পরিদর্শন করেন। ভাতখণ্ডেব ইচ্ছানুসারে মহারাজার কোনও পরিচয় ক্লাশে দেওয়া হইল না। বলা হইল ইনি ভাতখণ্ডের একজন সঙ্গীতানুরাগী উত্তর ভারতীয় বন্ধু। ভাতখণ্ডে যথারীতি ব্ল্যাক বোর্ডে সঙ্গীতের স্বরলিপি লিখিয়া ছাত্রদের উহা পড়িতে বলিলেন। তিনি ছাত্রদের পরীক্ষা লইবার জন্য কয়েকটী প্রশ্নও করিলেন। ছাত্রদের বুদ্ধিমানের

মত জবাব শুনিয়া মহারাজা অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং ভাতখণ্ডের সঙ্গীতশিক্ষা প্রচার পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলেন। গোয়ালিয়রে ফিরিয়া আসিয়া ভাতখণ্ডের বোম্বাই-এর বিদ্যালয়ের ন্যায় একটী বিদ্যালয় গোয়ালিয়রে স্থাপন করিবার বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য তিনি অনতিবিলম্বে ভাতখণ্ডেকে গোয়ালিয়রে আসিবার আমন্ত্রণ জানাইলেন।

ইতিমধ্যে বরোদার রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়কে ভাতখণ্ডের নির্দ্দেশানুসারে পুনর্গঠিত করা হইল। বরোদা রাজ্যের একজন জমিদার হীরজীভাই ডক্টর যন্ত্র-সঙ্গীতে সুশিক্ষিত ছিলেন। ইঁহাকে এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। ইঁহার অধ্যক্ষতায় ক্রমশঃ বিদ্যালয়টীর উন্নতি হইতে লাগিল এবং শেষ পর্য্যন্ত ইহাকে বরোদার এম. এস. ইউনিভার্সিটির কলা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বরোদা দরবারের ওস্তাদ ফৈয়জ হুসেন খাঁ এই বিদ্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ভাতখণ্ডের পরামর্শ অনুসারে তিনি এই বিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক হিসাবে শিক্ষা দিতে থাকেন। ইঁহার শিষ্য শ্রীআতা হুসেন খাঁ ও বদায়ুনের পরলোকগত ফিদা হুসেন খাঁ-এর পুত্র ওস্তাদ নিসার হুসেন খাঁ কয়েক বৎসর কাল এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

মহারাজার অনুরোধে ভাতখণ্ডে গোয়ালিয়রে গেলেন এবং একটি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ-পদ্ধতি, পরীক্ষা ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারের পূর্ণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। এইবার প্রশ্ন উঠিল উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের বিষয়ে, যাঁহারা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবেন। মহারাজা রাজ্যের

সকল সঙ্গীতজ্ঞদের ডাকিয়া আনিয়া ভাতখণ্ডের সম্মুখে গান গাহিতে বলিলেন যাহাতে ভাতখণ্ডে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত নির্ব্বাচন করিতে পারেন। এইভাবে শেষ পর্য্যন্ত ছয়জন নির্ব্বাচিত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরাজা-ভাইয়া পূছওয়ালে, শ্রীকৃষ্ণরাও দাতে, শ্রীভাস্কররাও খাণ্ডে-পারকার ও শ্রীগোখলে। মহারাজা ভাতখণ্ডেকে কয়েক মাস গোয়ালিয়রে থাকিতে অনুরোধ করিলেন, যাহাতে তিনি শিক্ষকদিগকে নিজ শিক্ষণ-পদ্ধতি শিখাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু বোম্বাই-এর অনেক কাজ থাকায় ভাতখণ্ডে এই প্রস্তাবে রাজী হইতে পারিলেন না। তখন স্থির হইল মহারাজা এইসব শিক্ষকদের বোম্বাই পাঠাইবেন। তাঁহারা ভাতখণ্ডের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিবেন এবং যে পর্য্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত বোম্বাই-এর গোয়ালিয়র রাজবাটীতে থাকিবেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার পাঠক্রম স্থির করিবার সময় ভাতখণ্ডে শিক্ষকদিগকে তাঁহাদের ধ্রুপদ, হোরি ও খেয়াল গানগুলির স্বরলিপি লিখিয়া তাঁহার সম্মুখে গাহিতে বলিলেন। এই সঙ্গীতের মধ্য হইতে ভাতখণ্ডে শিক্ষা দিবার জন্য সঙ্গীত নির্ব্বাচন করিবেন। তাঁহারা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কারণ বহু পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা গানগুলি তাঁহাদের গুরু, গোয়ালিয়রের বিখ্যাত খেয়াল গায়ক শঙ্কররাও পণ্ডিতের নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন। তখনকার দিনে শিক্ষালব্ধ সঙ্গীতকে অমূল্য রত্নের মত সযত্নে রক্ষা করার বস্তু মনে করা হইত, সহজে কাহাকেও দেওয়ার বস্তু মনে করা হইত না। ভাতখণ্ডে তখন তাঁহাদের গুরুর ঘরানার খেয়াল গানের এক বিস্তৃত

তালিকা তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। এই সঙ্গীতগুলি তিনি কয়েক বৎসর আগে শঙ্কররাও পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা একনাথ পণ্ডিতের (মাউ পণ্ডিত নামেও ইনি পরিচিত ছিলেন) নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শুধু এই নয়, মাউ পণ্ডিতের নিকট শেখা এই খেয়ালগুলি হইতে কয়েকটী খেয়াল তিনি গাহিয়াও শুনাইলেন। তাঁহাদের গুরুর ঘরানার বন্দেলি গান ভাতখণ্ডেকে গাহিতে শুনিয়া তাঁহাদের আর ইতস্ততঃ ভাব রহিল না, তাঁহারা বিনা দ্বিধায় খেয়ালের স্বরলিপি লিখিয়া দিলেন ও ভাতখণ্ডের অনুরোধ অনুসারে সেগুলি গাহিয়া শুনাইলেন। ইঁহারা এই গানগুলি স্বরলিপির সাহায্যে শেখেন নাই বলিয়া গাহিবার সময় এখানে-ওখানে কিছু পার্থক্য দেখা গেল। ইহা অবশ্যই স্বাভাবিক। ভাতখণ্ডের বিচারে শ্রীপুছওয়ালের গানগুলিই সবচেয়ে কম পরিবর্ত্তিত অবস্থায় শঙ্কররাও পণ্ডিতের শেখানো মূল গানগুলির নিকটতম ছিল। ইহার মধ্য হইতে কতকগুলি খেয়াল, ধ্রুপদ, সাদরা ও হোরি ভাতখণ্ডে গোয়ালিয়রের বিদ্যালয়ের শিক্ষা-সূচীভুক্ত করিলেন। গোয়ালিয়র হইতে প্রেরিত এই ছয়জন শিক্ষক ছয়মাসের মধ্যে ভাতখণ্ডের শিক্ষণ-প্রণালী উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া গোয়ালিয়রে ফিরিয়া গেলেন। ১৯১৮ সালে গোয়ালিয়রে বিখ্যাত মাধব সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। প্রথমে সহরের কেন্দ্রস্থলে 'গোর্খী' নামে এক গৃহে এই বিদ্যালয় সুরু হইল।

এই সময় বিদ্যালয়ের ক্লাশের জন্য ভাতখণ্ডে ক্রমিক পাঠ্য-পুস্তকের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া তাহা রচনা

করিতে আরম্ভ করেন। এইভাবে প্রসিদ্ধ মান-সম্মত সঙ্গীত-পাঠ্য-পুস্তক 'ক্রমিক পুস্তক মালিকা'-র সৃষ্টি হইল। মাধব সঙ্গীত কলেজ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ও আরও উচ্চতর শ্রেণী খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে 'ক্রমিক পুস্তক মালিকা'র আরও কয়েক খণ্ড বাহির হইল। পেশাদার গায়কদের কয়েকটী দলের দূরদৃষ্টির অভাব ও কুসংস্কারের জন্য কলেজকে কিছু বিরূপ সমালোচনা ও অপ্রত্যক্ষ অভিযোগের সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু জন-সাধারণের বিচারে ইহা ক্রমশঃ উচ্চ স্থান পাইতে লাগিল। এখান হইতে শিক্ষা পাইয়া শিক্ষক ও সঙ্গীতের স্নাতকগণ ইন্দোর, জয়পুর, বোম্বাই, পুনা, নাগপুর ও কলিকাতায় প্রেরিত হইতে লাগিলেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে গোয়ালিয়রে আসিতে রাজী হইলেন না বটে, কিন্তু ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত বৎসরে দুই-তিনবার সেখানে গিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতি বিষয়ে দেখাশোনা করিতেন। এইভাবে তিনি বরোদাতেও বৎসরে দুই-তিনবার গিয়া 'বরোদা স্টেট মিউজিক কলেজে'র ক্লাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেন। তিনি নিয়মিতভাবে এই বিদ্যালয়গুলির পরিচালনা ও উন্নতির সম্পর্কে বিবরণী পেশ করিতেন।[১]

কালে নাজির খাঁ রামপুর দরবারে সভা-গায়ক হিসাবে যোগদান করেন। উদয়পুরে ওস্তাদ জাকিরুদ্দীন খাঁ-এর

১ মাধব সঙ্গীত বিদ্যালয় সম্পর্কে তিনি যে পরিদর্শন-বিবরণী দিয়াছিলেন সেগুলি সম্প্রতি খয়রাগড় ইন্দিরা কলা-সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

কাছে তাঁহার আলাপ ও ধ্রুপদ শিক্ষা হইয়াছিল। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সহিত যোগাযোগের ফলে তাঁহার নাম সকলে জানিতে পারে। সঙ্গীতশাস্ত্রের জ্ঞান ও রাগের নিয়মাবলী উত্তমরূপে জানা থাকায় এবং গায়ক হিসাবে খ্যাতি থাকায় রামপুরের নবাব তাঁহাকে সভা-গায়কের পদে নিযুক্ত করেন। নবাব আলির সঙ্গে রামপুরের দরবারের যোগাযোগ ছিল। রাজা সাহেব ও কালে নাজির খাঁ-এর নিকট হইতে রামপুরের নবাব ভাতখণ্ডের সঙ্গীতবিষয়ক কার্যকলাপের কথা অনেক শুনিয়াছিলেন। রামপুরের নবাব ভাতখণ্ডের সম্বন্ধে আগ্রহী হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। রামপুর হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। নবাবের পরিবার সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ও তানসেনের বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত সেনিয়া ঘরানার ভক্ত ছিলেন। দরবার গায়ক ওয়াজির খাঁ ছিলেন তানসেন বংশের (কন্যার দিক হইতে) লোক। এই ওয়াজির খাঁ বীণকার ছিলেন নবাবের শিক্ষক। নবার ভাল সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার এক ভাই, প্রিন্স সদত আলি খাঁ (ছম্মন সাহেব নামে পরিচিত), উচ্চদরের সঙ্গীত-রসিক ছিলেন ও সুদক্ষ সুরশৃঙ্গারবাদক ছিলেন। তানসেন বংশের আর একজন বৃদ্ধ গায়ক, মহম্মদ আলি খাঁ, রামপুরে ছিলেন। তিনি রবাব বাজাইতেন। ওয়াজির খাঁ ও মহম্মদ আলি খাঁ, উভয়ের কাছেই তানসেন ঘরানার ধ্রুপদ ও হোরি গানের উত্তম সংগ্রহ ছিল। ছম্মন সাহেব মহম্মদ আলি খাঁকে নিজের ওস্তাদ বলিয়া মানিতেন, কারণ তাঁহার নিকট হইতে তিনি অনেক ধ্রুপদ ও হোরি বা হোলি গান শিক্ষা

করিয়াছিলেন। রাজা নবাব আলিও মহম্মদ খাঁ-এর নিকট হইতে ধ্রুপদ ও হোরি শিখিয়াছিলেন।[১]

রামপুরে থাকা কালেই পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সহিত নবাবের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং পরে দু'জনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। নবাব ও তাঁহার সঙ্গীতজ্ঞদের সহিত সঙ্গীত ও সঙ্গীতের তত্ত্ব সম্বন্ধে ভাতখণ্ডের অনেক আলোচনা হয়। তিনি উঁহাদের নিকটে প্রচলিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্বন্ধে নিজের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। প্রথমে কিছু বিরুদ্ধতা ও বিরূপ সমালোচনা হইয়াছিল। চিরাচরিত সংস্কারের জন্য এরূপ হওয়া স্বাভাবিক, বিশেষতঃ রামপুরের মত স্থানে। রামপুর ছিল রক্ষণশীল ও তানসেনের সময় হইতে মার্গসঙ্গীতের অব্যাহত ঐতিহ্যের শুদ্ধতম ঘাঁটী। কিন্তু পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ছিলেন প্রতিভাশালী ব্যাখ্যাকারী। তিনি তাঁহার তত্ত্ব বাস্তব দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যাখ্যা করিলেন। উদাহরণস্বরূপ, স্বয়ং ওয়াজির খাঁ বীণায় কিছু আলাপ ও বিস্তার করিলেন। ভাতখণ্ডে দেখাইয়া দিলেন যে, ওয়াজির খাঁর প্রস্তুত সঙ্গীত ঠিক তাঁহার লিখিত নিয়ম অনুসারে হইয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। স্বরলিপি ও তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা হইল। রামপুরের নবাবের মত মার্জ্জিতরুচি সঙ্গীতপ্রেমীকে নিজের মতে আনিতে পারা ভাতখণ্ডেব অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। নবাব সাহেব ভাতখণ্ডেকে রামপুরে থাকিতে

---

১ রাজা নবাব আলি পরে এই সকল সঙ্গীত তাঁহার সরিফ-উন-নাঘামত নামক পুস্তকাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করেন।

অনুরোধ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, ভাতখণ্ডে যেন নিজেকে দরবারের একজন সদস্য বলিয়া মনে করেন এ অনুরোধও করিলেন।

রামপুরে অবস্থানকালীন ভাতখণ্ডের কাজের বিষয়ে একটী কৌতূহলোদ্দীপক সত্য কাহিনী আছে। ইহা হইতে শুধু যে সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার অনুরাগের গভীরতা বুঝা যাইবে তাহাই নহে, তাঁহার বাস্তব জ্ঞান সম্বন্ধেও জানা যাইবে। বদ্ধমূল ধারণাবশতঃ তখন নূতন চিন্তাধারার প্রতি কী পরিমাণ সন্দেহ ছিল তাহা তিনি জানিতেন। তিনি বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন চতুর ব্যক্তি ছিলেন এবং কীভাবে অনায়াসে এইসব সন্দেহজনিত বাধা কখনও লঘু, কখনও হাস্যোদ্দীপক অবস্থার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হয় তাহাও জানিতেন। নবাবের গুরু ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ-এর নিকটে অনেক মৌলিক ও অবিকৃত ধ্রুপদ ও হোরি গানের অমূল্য সঞ্চয় ছিল। তানসেনের সময় হইতে এগুলি চলিয়া আসিতেছিল। ওয়াজির খাঁ স্বভাবতঃই এগুলি ভাতখণ্ডেকে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কারণ এগুলি ছিল তাঁহার অমূল্য পারিবারিক সম্পদের মত। যাহা হউক, ওয়াজির খাঁ নবাবের গুরু হইলেও দরবারের গায়ক হিসাবে নবাবের কর্ম্মচারী ছিলেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে অবস্থাটী সযত্নে চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে নবাবের সহযোগিতা ও সাহায্য নেওয়া। নবাব নিজে ভাল সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ভাতখণ্ডে ঠিক করিলেন নবাবের শিষ্য হইবেন। স্বভাবতঃই নবাব ইহাতে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করিলেন, কারণ তখনকার দিনে শিষ্যত্ব গ্রহণ

করা ও শিষ্য গ্রহণ করা দুই-ই ছিল গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মত শিষ্যলাভে গুরুর সম্মান অনেক বৃদ্ধি পায়। পণ্ডিতজী নবাবের নিকট পাঠ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কিছুদিন পরে নবাবকে বলিলেন যে তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা যে তিনি রামপুর ঘরানার অমূল্য সঙ্গীতসম্পাদকে স্বরলিপিবদ্ধ করিতে চান, যাহাতে চিরকাল সঙ্গীতপ্রেমীরা সহজেই তাহা পাইতে পারেন। এই মর্ম্মে তিনি নবাবকে অনুরোধ জানাইলেন। নবাব উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন এবং পণ্ডিত ভাতখণ্ডে যাহা চাহিবেন তাহা দিবার জন্য ওয়াজির খাঁকে বলিয়া দিলেন। মালিকের হুকুম পালন করা ছাড়া ওয়াজির খাঁ-এর অন্য উপায় ছিল না। এইভাবে ভাতখণ্ডে সেনিয়া ঘরানার অমূল্য ধ্রুপদ ও হোরি সঙ্গীতের সঞ্চয় প্রাপ্ত হইলেন। প্রশংসনীয় ও মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার অনুসৃত নানা পন্থার মধ্যে এটা একটী কৌতুককর দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য, নিজ গুরু নবাব সাহেবের প্রতি তাঁহার খুব শ্রদ্ধা ছিল।

রামপুরের নবাবের সভাপতিত্বে ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর দিল্লীতে অল-ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে দিল্লীতে একটী কেন্দ্রীয় একাডেমী অব্ হিন্দুস্থানী মিউজিক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথম উত্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বাবদ যথেষ্ট অর্থ দিবার প্রতিশ্রুতি নবাব দিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইল না। শ্রীব্রিজ কিষণ কাউল এই অধিবেশনের সম্পাদক ছিলেন।

১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে বেনারসে 'অল-ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স'-এর তৃতীয় অধিবেশনে আবার উপরোক্ত প্রস্তাবটী বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়। শ্রীমতী আতিয়া বেগম ফৈজী রহিম একটী পরিকল্পনা পেশ করেন। এই পরিকল্পনাটী ছিল বিরাট। দশ হইতে পনের লক্ষ টাকা খরচ লাগিতে পারে দেখিয়া শেষ পর্য্যন্ত ইহা পরিকল্পনাই রহিয়া গেল, কার্য্যে পরিণত হইল না।

এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে যথারীতি আলোচনা, প্রবন্ধ পাঠ, বিতর্ক ও সঙ্গীত অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা সকলেই ইহাতে যোগদান করেন। ওস্তাদ ফৈয়াজ হুসেন খাঁ, জাকিরুদ্দীন খাঁ, নাসিরুদ্দীন খাঁ, আল্লা বন্দে খাঁ, মুসারফ খাঁ বীণকার, ইমদাদ খাঁ ও তাঁহার পুত্রদ্বয়, সাদিক আলি খাঁ ও ইনায়েৎ খাঁ, ফিদা হোসেন খাঁ (সরোদ বাদক), মুস্তাক হোসেন খাঁ, হাফিজ আলি খাঁ (সরোদ বাদক), বরকতউল্লা ও পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর সকলেই আসিয়াছিলেন।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে ভাতখণ্ডে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদিগকে কয়েকটী রাগ বিষয়ে যে মতানৈক্য আছে সে বিষয়ে আলোচনা করিতে আহ্বান করেন। আলোচনার ফলে একটী সর্ব্বজনগ্রাহ্য মত গৃহীত হইল এবং সেই রাগগুলির নিয়ম সুনির্দ্দিষ্ট করা হইল। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাঁহার 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি'র চতুর্থ খণ্ডে এই নিয়মগুলি সন্নিবেশিত করেন।[১]

---

১ মূল মারাঠী সংস্করণের ৩৬৭ পৃষ্ঠায়।

ভাতখণ্ডের সর্ব্বদাই উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে এইরূপ শাস্ত্রীয় আলোচনা 'অল-ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স'-এ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু পেশাদার গায়করা স্বভাবতঃ এই ধরণের বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিতে চাহিতেন না। তাঁহাদের ভয় ছিল যে, এইরূপ বিতর্কে যোগ দিতে হইলে নিজ নিজ ঘরানা সঙ্গীত অপর সঙ্গীতজ্ঞদের সম্মুখে পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা সহযোগে গাহিয়া দেখাইতে হইবে। অথচ ঈর্ষাবশতঃ এই সঙ্গীতগুলি তাঁহারা অমূল্য সম্পদের মত অপরের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিতে চাহিতেন। আরও ভয় ছিল অপর সঙ্গীতজ্ঞরা হয়তো তাঁহাদের পদ্ধতির প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে বিতর্ক সৃষ্টি করিতে পারেন। মিউজিক কনফারেন্সের একমাত্র দিল্লী অধিবেশনে এই ধরণের শাস্ত্রীয় আলোচনা সভা হইয়াছিল। পরে ১৯২৪ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ অধিবেশনে ভাতখণ্ডে আবার এইরূপ সভা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞের বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্য এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে হয়। পরবর্ত্তীকালে কানপুর ও আজমীরে অনুষ্ঠিত মিউজিক কনফারেন্সে পুনরায় এ বিষয়ে চেষ্টা করা হয়। সেইসব কনফারেন্সে আমি উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু উপরোক্ত কারণে সেখানেও তাহা সম্ভব হয় নাই। ভাতখণ্ডের 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি'-র চতুর্থ খণ্ডে দিল্লী অধিবেশনের কথা বলিতে গিয়া তিনি ভবিষ্যতে এই ধরনের আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের অনতিক্রমণীয় বাধা সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন। এই পুস্তকটী প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে। লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত অল-ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সের কয়েক বৎসর পরে পুস্তকটী লিখিত হয়।

যখন ভাতখণ্ডের 'ক্রমিক পুস্তক মালিকা'-র পুস্তকাবলী প্রকাশিত হইতে সুরু হয় তখন 'গীত মালিকা' সিরিজের বই-গুলি বন্ধ হইয়া যায়। 'ক্রমিক পুস্তক মালিকা'-র অন্যান্য খণ্ড প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ইহার পূর্ব্বপ্রকাশিত খণ্ডগুলি পরিবর্দ্ধিত আকারে পুনঃপ্রকাশিত হইতে থাকে। সারা ভারতে পুস্তকগুলির খুব চাহিদা হয়। এই পুস্তকগুলির বিক্রয় হইতে যে অর্থাগম হইত তাহা আবার অন্যান্য খণ্ড প্রকাশের জন্য ও প্রকাশিত পুস্তকের নূতন সংস্করণের জন্য ব্যয়িত হইত। 'ভাতখণ্ডে সঙ্গীত প্রকাশন' নামে একটি ট্রাস্ট গঠিত হইল। ইহার সভাপতি হইলেন ভাতখণ্ডে ও সদস্য হইলেন শঙ্কর রাও করনাদ, শ্রীবালচন্দ্র এস. সুখতানকর এবং আরও কয়েকজন। পুস্তক বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকা সঙ্গীত-বিষয়ক আরও রচনা প্রকাশের জন্য ব্যয়িত হইবে স্থির হইল।

৭

১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ-এ 'অল-ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স'-এর চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। যথারীতি পণ্ডিত ভাতখণ্ডের নির্দ্দেশানুসারে ইহা আয়োজিত হইল। একদা উত্তরপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী ও প্রমুখ তালুকদার পরলোকগত রায় রাজেশ্বর বালির কাকা দরিয়াবাদের রায় উমানাথ বালি পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে খুব সাহায্য করেন। দরিয়াবাদ পরিবারের সকলেই শিল্প ও সঙ্গীতের খুব অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের বেতনভোগী সঙ্গীতজ্ঞ ছিল এবং তাঁহারা ইহাদের নিকট হইতে কিছু সঙ্গীত শিক্ষাও করিয়াছিলেন। রাজা নবাব আলির নিকট হইতে রায় উমানাথ বালি ভাতখণ্ডের কথা এবং তাঁহার সঙ্গীতবিষয়ক কার্য্যাবলীর কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি নিজে দিল্লী ও বেনারসে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। রায় উমানাথ বালি অনেক দিন হইতে উত্তরপ্রদেশের কোনও স্থানে একটী সঙ্গীত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। ভাতখণ্ডের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ-কালেই তিনি এই কথা তাঁহাকে বলিলেন। কিন্তু দিল্লীতেও এইরূপ একটী শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব সেই

অধিবেশনে ছিল বলিয়া পণ্ডিতজী এ বিষয়টী ভবিষ্যতে বিবেচনার জন্য স্থগিত রাখিলেন। উমানাথ বালি ভাতখণ্ডের সহিত পত্রালাপ চালাইতে লাগিলেন এবং বারংবার এ বিষয়ে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। 'অল-ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স' বা নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ অধিবেশন সংগঠনে তিনি সাহায্য করিবেন জানাইলেন এবং ভাতখণ্ডেকে লক্ষ্ণৌ ও দরিয়াবাদে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। ভাতখণ্ডে আসিবার পর অধিবেশনের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া চূড়ান্তরূপে কার্য্যপ্রণালী স্থির করা হয়। অধিবেশনের ব্যবস্থাপনার কাজ উমানাথ বালি ও রাজা নবাব আলি করিলেন।

সুদৃশ্য ঐতিহাসিক কাইজার বাগ বারদরীতে কনফারেন্স হইল। শিক্ষামন্ত্রী রায় রাজেশ্বর বালি কাকার এই কাজে খুব আগ্রহ দেখাইলেন ও সর্ব্বরকমে সাহায্য করিলেন। উত্তরপ্রদেশের তখনকার গভর্ণর স্যার উইলিয়ম ম্যারিস-এর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি গভর্ণরকে এ বিষয়ে আগ্রহশীল হওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্যার ম্যারিস প্রাচ্য শিল্প ও সঙ্গীত সম্বন্ধে স্বয়ং আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, এমন কি পাঁচশত টাকা অধিবেশনের খরচের জন্য দান করিলেন। এই অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করিতেও সম্মত হইলেন এবং উত্তরপ্রদেশের তালুকদার ও জমিদারদিগকে অধিবেশনের তহবিলে দান করিতে অনুরোধ করিলেন। ভাতখণ্ডে অধিবেশনের বিষয়-সূচী ও কার্য্যক্রম প্রস্তুত করিলেন। বারদরী লোকে

লোকারণ্য হইয়া গেল। প্রায় পাঁচ হাজার লোক অধিবেশনে যোগদান করেন। অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। এই সঙ্গে একটী অঙ্কনশিল্পপ্রদর্শনীও করা হইয়াছিল। প্রবন্ধপাঠ, আলোচনা ইত্যাদির পরে বড় বড় শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান হইল। এই অধিবেশনে যোগদান ও সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। এই অধিবেশনের বিরাট সাফল্যের ফলে সঙ্গীতের বাণী সমস্ত উত্তর ভারতে ছড়াইয়া পড়িল।

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের পঞ্চম ও ভাতখণ্ডের জীবিত অবস্থায় শেষ অধিবেশন ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সেই কাইজার বাগ বারদরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লক্ষ্ণৌতে একটী সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপনার প্রস্তাব উত্থাপন করা ও তাহা অনুমোদন করানো। সকলেই এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

ইহার কয়েকমাস পরে ১৯২৬ সালেব জুলাই মাস হইতে কাইজার বাগ রোডের টপওয়ালী কোঠিতে সঙ্গীত শিক্ষার ক্লাশ খোলা হইল। পণ্ডিতজীর বিশেষ অনুরোধে আমি লক্ষ্ণৌ কলেজে যোগদান করিলাম। ১৯২৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর গভর্ণরের উপস্থিতিতে কাইজার বাগ বারদরী হলে এই শিক্ষায়তনটীকে 'ম্যারিস কলেজ অব হিন্দুস্থানী মিউজিক' নামে অভিহিত করা হইল। ক্লাশে যে স্বরজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার একটী নমুনা প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইল। ইহার পরে সঙ্গীত শিক্ষার ক্লাশগুলিতে যখন পাঠ দেওয়া

হইতেছিল তখন গভর্ণর ম্যারিস পরিদর্শন করিয়া আসিলেন এবং শিক্ষার পদ্ধতি ও কাজের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট হইলেন। বরোদা ও গায়কোয়াড় রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অনুরূপ পাঠ্যক্রম এখানেও নির্দ্দিষ্ট হইল এবং 'ক্রমিক পুস্তক মালিকা' সিরিজের বই এখানেও পাঠ্য করা হইল। বোম্বাই প্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ইনস্‌পেক্‌টার অব স্কুলস্‌, মিঃ মাধবরাও যোশী (দাদাসাহেব যোশীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা), এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। মিঃ যোশী সঙ্গীত উৎসাহী ছিলেন এবং কিছু পরম্পরাগত সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় পরিকল্পনা করিবার অভিজ্ঞতাও তাঁহার ছিল। প্রথমে যে শিক্ষকমণ্ডলী নিযুক্ত হন তার মধ্যে আমি ব্যতীত শ্রী জি. এন. নাটু নামে গোয়ালিয়র মাধব মিউজিক কলেজের একজন কণ্ঠসঙ্গীতের স্নাতক, লক্ষ্ণৌ-এর ধ্রুপদ গায়ক আহমদ খাঁ, সারেঙ্গীবাদক বকর আলি খাঁ ও লক্ষ্ণৌ-এর বিখ্যাত তবলা-বাদক আবিদ হুসেন ছিলেন। কিছুদিন পরে হায়দরাবাদের (দক্ষিণ) তানরস খাঁ-এর পরিবারের মহম্মদ সিদ্দিকের পুত্র বাবা নাসির, সাদিক আলি খাঁ-এর শিষ্য বৃদ্ধ গায়ক ছোটে মুন্নে খাঁ, নানা সাহেব পানসে ঘরানার পাখোয়াজবাদক ইন্দোরের সখারামজী গুরাও এবং মিঃ বি. এস. পাঠক নামে গোয়ালিয়রের মাধব মিউজিক কলেজের আর একজন স্নাতক শিক্ষকমণ্ডলীতে যোগ দেন। কয়েক বৎসর পরে হামিদ হুসেন খাঁ নামে একজন দক্ষ সেতারবাদকও নিযুক্ত হন। এই সকল সুযোগ্য শিক্ষকদিগের শিক্ষণে ম্যারিস মিউজিক কলেজের উন্নতি হইতে লাগিল। কলেজের উন্নতির খবর জনসাধারণকে

জানানোর জন্য মাঝে মাঝে কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গীতের আসর বসিত। ভাতখণ্ডে নিজে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌতে থাকিলেন। কলেজ ভবনেই শিক্ষকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌতে দীর্ঘদিন বাসকালে ভাতখণ্ডে নিজে কলেজের কাজ দেখাশোনা করিতেন। মাঝে মাঝে তিনি ক্লাশ নিতেন এবং সঙ্গীততত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। এই কলেজ খুলিবার ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট হইতে খুব উৎসাহ পাওয়া গিয়াছিল। এই কলেজের প্রথম বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্বর্গীয় ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখার্জ্জী, বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা পাহাড়ী সান্ন্যাল ও স্বর্গীয় ডঃ এইচ. এন. হুক্কু ছিলেন। পরের বছর বহু ছাত্র ভর্ত্তি হইবার জন্য আসিলে টপওয়ালী কোঠিতে এতগুলি ক্লাশের স্থান সঙ্কুলান হইবে না দেখিয়া চাঁদনীওয়ালী কোঠি নামে পাশের বাড়ীটী ভাড়া নেওয়া হয়। এই বাড়ীর একটী কক্ষে ভাতখণ্ডে থাকিতেন এবং এখানেই সঙ্গীত বিষয়ে লেখাপড়া করিতেন। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাইজার বাগ রোডস্থিত গভর্ণমেণ্টের 'ওল্ড কাউন্সিল চেম্বার' নামক ভবন ও ইহার পোষ্ট অফিস ও ষ্টোরস হাউসে কলেজ স্থানান্তরিত করা হইল।

১৯২৮ হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত পণ্ডিতজী বছরে অন্ততঃ দু'বার করিয়া কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিতেন। এই সময়ে তিনি বরোদা ও গোয়ালিয়র রাজ্যের মিউজিক কলেজ পরিদর্শন করিতেও যাইতেন।

গোয়ালিয়রের বিভিন্ন গায়কদের দ্বারা গীত খেয়ালের বিভিন্ন রূপের সামঞ্জস্যবিধানের ও চূড়ান্ত মীমাংসার পর তাহা পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত করিবার জন্য ভাতখণ্ডে মাধব মিউজিক কলেজের শিক্ষক রাজা ভাইয়া, কৃষ্ণরাও দাঁতে, ভাস্কররাও খাণ্ডেপারকার এবং গোখলেকে লইয়া হরিদ্বারে গেলেন। সেখানে প্রায় একমাস থাকিয়া এ বিষয়ে শেষ মীমাংসা করিয়া এগুলি প্রকাশ করিলেন।

ম্যারিস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ের মধ্যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের জীবনব্রতের অধিকাংশ কাজ সমাপ্ত হইয়াছিল। তিনি 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি'র চতুর্থ খণ্ড প্রস্তুত করিতেছিলেন। ১৯৩০ সালে ইহা সমাপ্ত হয় এবং ১৯৩২ সালে ইহা প্রকাশিত হয়। ম্যারিস কলেজ ১৯৩০ সাল হইতে 'সঙ্গীত' নামে একটী ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে সুরু করে। এই পত্রিকায় হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় সঙ্গীত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। ছয়টী সংখ্যা বাহির হওয়ার পরে অর্থাভাববশতঃ পত্রিকাটীর প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। ভাতখণ্ডে নিজেও এই পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। 'পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকটী মুখ্য সঙ্গীত-পদ্ধতির তুলনামূলক বিচার' নামে তাঁহার জনপ্রিয় পুস্তিকা এই ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বাহির হয়। সম্পূর্ণ পুস্তিকাটী পরে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। হেমেন্দ্রলাল রায় (বি. এ.) ও রবীন্দ্রলাল রায় (বি. এস্‌সি.) নামে ম্যারিস কলেজের দুইজন বাঙালী ছাত্র এই পত্রিকাটীর প্রকাশে বিশেষ সাহায্য করেন। ইহারা ছিলেন দুই ভাই। দুইজনেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্র ছিলেন। ১৯৩০ সালে ইঁহারা ম্যারিস কলেজে যোগদান করেন ও পূর্ণ পাঁচ বছরের কোর্স (কণ্ঠসঙ্গীতের) শেষ করিয়া ১৯৩৬ সালে 'সঙ্গীতবিশারদ' হন।[১] ভাতখণ্ডে যখন ম্যারিস কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিতেন তখন দুই ভাই প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

এই কলেজ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্নাতকদের মধ্যে খ্যাতিমান ব্যক্তির সংখ্যা কম নয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অন্যান্য সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে ও আকাশবাণীতে দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং এখনও আছেন।

শেষের দিকে ১৯৩৩ সালে ভাতখণ্ডে একবার মাত্র ম্যারিস কলেজ পরিদর্শন করিতে যান। বোম্বাই-এ ফিরিয়া সহসা একদিন সকালে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। তিন বৎসর শয্যাশায়ী থাকিবার পর ১৯৩৬ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর গণেশ চতুর্থীর দিন তাঁহার মৃত্যু হয়।

১ শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মারা যান। শ্রীরবীন্দ্রলাল রায় এখন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত শাখার প্রধান হিসাবে কাজ করিতেছেন।

৮

ভাতখণ্ডে আধুনিক ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের ব্যাখ্যার বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু যদি কেহ বৈজ্ঞানিক ভাবে আধুনিক স্বরসপ্তকের স্থান সুনির্দ্দিষ্ট করিতে ও ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন এবং তাহা প্রামাণিক শিল্পীর দ্বারা গান করাইয়া প্রমাণিত করিতে পারিতেন, তবে তাঁহার আপত্তি ছিল না। তিনি স্বরগ্রামের যে-সব নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেগুলি ছিল রাগের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার উপযোগী কয়েকটী শব্দের তালিকা মাত্র। স্বর (tone) ও অর্দ্ধস্বর (semitone) এর মধ্যে যে ব্যবধান তিনি মানিয়া নিয়াছিলেন, বিশেষতঃ বিকৃত স্বরের সম্বন্ধে, তাহা ছিল রাগের সঠিক আরোহ-অবরোহের জন্য কতটা চড়ায় ও খাদে উঠা-নামা করিতে হইবে তাহার সীমা-নির্দ্ধারক চিহ্নমাত্র। উদাহরণস্বরূপ, কোমল গান্ধার স্বরটি শুদ্ধ ঋষভ এবং শুদ্ধ গান্ধারের মধ্যে অবস্থিত। রাগবিশেষের প্রয়োজনমত ইহা ঐ দুটি শুদ্ধ স্বরের মধ্যে যে-কোনো স্থানে সঞ্চরণ করিতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—দরবারি কানাড়ায় কোমল গান্ধার ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহা যখন 'রে'-র অনুষঙ্গে গাওয়া হয় তখন এই চৌহদ্দির সর্ব্বনিম্ন সীমানায়, অর্থাৎ শুদ্ধ 'রে' হইতে সামান্য উঁচুতে উচ্চারিত হয়। বস্তুতঃ

তখন ইহা নিজের প্রকৃত স্থান (২৮৮ কম্পন প্রতি সেকেণ্ড) আর সর্ব্বনিম্ন সীমানার মধ্যে আন্দোলিত হয়। এই রাগেই কোমল গান্ধার যখন 'মা' এর অনুষঙ্গে গাওয়া হয় তখন আর একটু উঁচু পর্দ্দায় ওঠে। যথা—

নিধা নি সা রেসা , রে গা, রেগা, রেগা, রে সা রে গাসা।

এই তানে কোমল গান্ধারের সর্ব্বনিম্ন সীমানায় গাওয়া হয়। আবার নিম্নলিখিত তানে কোমল গান্ধার-এর চেয়ে আর একটু উঁচুতে গাওয়া হয়—

মা, পা, মাগা, মাগা, মাগা, মাসা , রে, সা।

এইভাবে ললিত রাগে তীব্র মধ্যম দু'টী শুদ্ধ মধ্যমের মধ্যে থাকিলে সর্ব্বনিম্ন স্বরে গাওয়া হয়। আবার উত্তরাঙ্গে উঠিবার সময় তীব্র মধ্যম আর একটু উঁচুতে গাওয়া হয়। ভাতখণ্ডের মতে এই সব বিশদ শিক্ষা গুরু বা বড় শিল্পীর গীত গান হইতে শিক্ষা করিতে হয়।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ভাষা ও সঙ্গীতে ব্যাকরণ ও লিপির সীমা কতদূর তাহা জানিতেন এবং প্রচলিত ভাষা ও প্রচলিত সঙ্গীতের ধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রাখা প্রয়োজন বোধ করিতেন। তিনি জানিতেন যে, স্বরলিপির মধ্যে সব-কিছু বলা সম্ভব নয়। সেই অনুক্ত কথার ব্যাখ্যান শিক্ষক ও ছাত্রের অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দিতে হয়। ভাতখণ্ডের রচিত সঙ্গীততত্ত্ব ও স্বরলিপি একটী কাঠামো-স্বরূপ, যাহা হইতে শিক্ষার্থী গুরু বা বড় শিল্পীর নিকট হইতে শোনা সঙ্গীত খুব সহজে নিজের গলায় তুলিয়া নিতে সক্ষম

হয়। পুরুষানুক্রমে অযথা বিকৃত না হইয়া সঙ্গীতের মূল ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পক্ষে এই তত্ত্ব ও স্বরলিপি মোটামুটি উপযোগী।

ভাতখণ্ডের গবেষণার প্রথম দিকে সঙ্গীততত্ত্বের অবস্থা কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে নিজের মত প্রকাশ করিয়া একটী প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "সর্ব্বত্র এই কথাই বলা হইয়া থাকে যে, মোগল রাজত্বের সময় উত্তর ভারতে সঙ্গীতের উন্নতি হইয়াছিল। একথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু আমার সন্দেহ আছে যে, সে সময়ে কোনও ব্যক্তি সঙ্গীত সম্বন্ধীয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছিলেন কিনা। নায়ক গোপাল, বৈজু, ধোন্দি, হরিদাস ইত্যাদি বড় বড় নায়কগণ কেহ সঙ্গীত সম্বন্ধীয় কোনও পুস্তক লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের সঙ্গীত রচনা দেখিয়া তাঁহাদের বিদ্যার গভীরতা সম্বন্ধে সংশয়মুক্ত হইতে পারি না। সেই প্রাচীন বাদশাহী আমলে হয়ত এখানে ওখানে সঙ্গীতের তত্ত্ব সম্পর্কে ভাষণ দিয়া এবং সঙ্গীত গাহিয়া তাঁহারা নাম করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি সামান্যতম প্রমাণও পাই নাই যাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, এইসব নায়কদের একজনও 'সঙ্গীতরত্নাকর'-এর মত পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সঙ্গীত সম্পর্কে নিজেরাও কিছু লেখেন নাই। ইহার কারণ কী হইতে পারে? তাঁহাদের সঙ্গীত রচনার সবচেয়ে প্রামাণ্য সংস্করণে সপ্ত স্বর, তিন গ্রাম, একুশ মূর্চ্ছনা, বারো বিকৃত, বাইশ শ্রুতি এবং উরাপা ও তিরাপা লাগ, ডাঁট, আরোহী, অবরোহী, অস্থায়ী, সঞ্চারী, স্বর-বেওড় ইত্যাদি প্রাথমিক পরিভাষার উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়।

ইহার মধ্যে কোনও গভীর অধ্যয়নের প্রমাণ দেখা যায় না। এই সব নায়কেরা তো মাত্র চারশত বৎসর আগেকার লোক। তাঁহারা নিজেদের সঙ্গীততত্ত্বের জ্ঞান লিখিয়া রাখিতে পারিতেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই 'রত্নাকর' ও অন্যান্য গ্রন্থের নাম অন্ততঃ শুনিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই এই সব গ্রন্থের কোনও উল্লেখ করেন নাই। আমার অনুমান তাঁহারা আমাদের সময়কার সঙ্গীতজ্ঞদের মতই শুধু সঙ্গীতের প্রয়োগক্ষেত্রেই নিপুণ ছিলেন, যদিও তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন। ইহারা সংস্কৃত ভাষা জানিতেন বলিয়া অনুমান হয় না। এখনকার হিন্দু গায়কদের মত তাঁহারও নিশ্চয় সঙ্গীতের সম্ভাব্য তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ও উল্লেখ করিতেন। সঙ্গীতের দ্বারা পাথর গলানো, হরিণকে আকৃষ্ট করা এবং মালা গাঁথা, আকবরের সময়ে মল্লার রাগের গানে বৃষ্টি নামা ও দীপক রাগের গানে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠা ইত্যাদি কাহিনী সঙ্গীতের প্রতীকমূলক প্রশস্তি হিসাবে চলিতে পারে, কিন্তু এই সব কাহিনীকে সত্য ঘটনা বলিয়া মানিতে আমি প্রস্তুত নহি। যতদিন না আমি এই সব বিস্ময়কর ঘটনা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করি ততদিন আমি আমার বন্ধু ও শিষ্যদের বলিব যে, এই সব ঘটনা কাল্পনিক। খুব সম্ভব এগুলি কবির কল্পনা-প্রসূত চিত্র মাত্র। বাদশাহ আকবর খুব সঙ্গীত ভালবাসিতেন, এ কথা আমরা সকলে মানিয়া লইব। যদি আমার মত দরিদ্র ব্যক্তি এত বেশী সঙ্গীতপ্রেমী হইতে পারে তবে তাঁহার মত এত বড় বাদশাহ অবশ্যই আরও বেশী সঙ্গীতপ্রেমী হইবেন। ইহাতে বিচিত্র কী!

নিশ্চয়ই তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় তখনকার দিনের অনেক বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞ বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র এই কথার ভিত্তিতে এই সব বিস্ময়কর তথ্য আমি সত্য ঘটনা বলিয়া মানিতে পারি না। আমার বন্ধুরা তর্ক করিতে পারেন যে, শব্দ একটী বিচিত্র শক্তি। কোনও বিশেষ স্বরসংযোজনা হয়ত অতিপ্রাকৃত এবং অলৌকিক প্রভাব উৎপন্ন করিতে পারে। তাঁহারা বলিবেন যে, আজকাল আমরা সঙ্গীতের সূক্ষ্ম ছন্দ ও ঝঙ্কার সম্বন্ধে অজ্ঞ বলিয়া সেরূপ অলৌকিক প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারি না। আমার মনে হয় না যে, বর্ত্তমানে এরূপ যুক্তিতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিব। আজ যখন আমি সঙ্গীতশিল্পীদের কাছে গ্রন্থের বিষয় উত্থাপন করিতে যাই তখন তাঁহারা বিরক্ত বোধ করেন এবং বলেন, 'সঙ্গীতের তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার এই অপ্রয়োজনীয় ভাষণ সম্বন্ধে আমাদের কোনও আগ্রহ নাই, আমরা কেবল দেখিতে চাই আপনি কেমন করিয়া গান করেন বা বাজান—এবং একমাত্র তাহাতেই আমাদের আগ্রহ আছে।' এই শিল্পিগণ যে কেবলমাত্র তানসেন, গোপাল নায়ক এবং আমীর খুসরু প্রভৃতির সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী আগ্রহ ও বিশ্বাসের সহিত শুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন তাহা নহে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, 'তানসেন যে সঙ্গীত গাহিয়া পাথর গলাইয়াছিলেন, হরিণদের আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের গলায় মালা পরাইয়াছিলেন, পাথরের মধ্য হইতে তানপুরার বাজনার মত শব্দ বাহির করিয়াছিলেন সেই সব সঙ্গীত আমাদের কাছে রক্ষিত আছে।' কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অতীতের সেই কাহিনীর নায়কেরা আজ

মৃত, সেই সঙ্গীতও আর নাই। অতীতের সেই সরল বিশ্বাসপরায়ণ মানুষ এ যুগে আর নাই, এ কথা বোধহয় এই সব ওস্তাদেরা ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন আমরা বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের যুগে বাস করি। হাতে কলমে প্রমাণ করিতে না পারিলে এ যুগে এই সব ধারণার কোনও স্থান নাই। আমার কোনও কোনও বন্ধু বলেন যে, 'থিওসফি' এই রহস্যের ব্যাখ্যা করিতে পারে। বন্ধুদের ও তাঁহাদের ধারণার প্রতি সম্ভ্রমবশতঃ আমি নীরব থাকি। আমার মতামত আমার পাঠকদের জন্য সম্মুখে রাখিতে চাই। যদি সঙ্গীতের শক্তি প্রদর্শন করিয়া কেহ আমার মত ভুল প্রমাণিত করিতে পারেন তাহা হইলে আমি সুখী হইব। যে উত্তর ভারত সঙ্গীতশিল্পের ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছিল, সেখানে সঙ্গীত-তত্ত্বের এত করুণ অবস্থা! সঠিক জ্ঞান ও তথ্যের অভাব দেখিয়া আমার মনোভাব ব্যক্ত করিতেছি। মহান সঙ্গীত-শিল্পীদের দেশ উত্তর ভারত আজ সঙ্গীতের জ্ঞান অতি অল্পই রক্ষা করিয়াছে। মাত্র চারশত বৎসর আগে সঙ্গীতনায়কেরা জীবিত ছিলেন। আজ তাঁহাদের সঙ্গীতকলার সেবার কোনও লিখিত তথ্যের চিহ্নও পাওয়া যায় না! তাঁহাদের বংশ-ধরেরা এ বিষয়ে প্রায় কিছুই জানেন না, পড়িতে পারেন আরও কম! এই নায়কদের কেহ সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন বলিয়া কোনও প্রমাণ পর্য্যন্ত নাই। আগ্রা সহর ছিল সম্রাট আকবরের অতি প্রিয় স্থান। এখন সেখানে যে সঙ্গীত শোনা যায় তাহা সেখানকার নর্ত্তকী ও তাহাদের সারেঙ্গীবাদকদের সঙ্গীত মাত্র! এই অবস্থা যে দেখিবে

সে অত্যন্ত নিরুৎসাহ বোধ করিবে। নায়কদের কেহ 'রত্নাকর' বা অন্য কোনও গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। সম্ভবতঃ এই ধরণের গ্রন্থপাঠের প্রচলন মোগল বাদশাহদের সময়ে ছিল না। তখনকার সঙ্গীতের সাধারণ প্রচলন মত তানসেন ও অন্যান্য গায়কেরা ছিলেন সঙ্গীতের বড়দরের কুশলী কলাকার; তাঁহাদের সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থ পাঠ করিবার প্রয়োজন ছিল না বা করিতে হইত না। তখনকার দিনের সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীর বিষয়ে আমাদের গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণা করা উচিত।"

পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে বহু পুরাতনপন্থী পেশাদার গায়কগণের নিরন্তর প্রতিকূলতা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের শিক্ষা ও সংস্কার অনুযায়ী তাঁহারা সঙ্গীতের পাঠ্যপুস্তক এবং পুস্তক হইতে শিক্ষাগ্রহণকে ঘৃণা করিতেন। সঙ্গীতের সম্বন্ধে যুক্তি-সম্মত মনোভাব এবং নূতন বিধিবদ্ধ প্রণালীর প্রতি তাঁহাদের অত্যন্ত সন্দেহ ছিল। ইহা ছাড়া আরও কারণ ছিল। আগেকার দিনে নিজ নিজ ঘরানার শ্রেষ্ঠত্বের যে দাবি তাঁহারা করিতেন সে দাবি হারাইবার ভয় ছিল, কেহ কেহ আবার দাবি করিতেন যে গুরুর নিকট হইতে তিনি যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাপেক্ষা তাঁহার নিজের প্রণালী বিভিন্ন ধরণের।

বস্তুতঃ ভুল বোঝাবুঝি ও অজ্ঞতাই ছিল অধিকাংশ বিরুদ্ধতার হেতু। ভাতখণ্ডের জীবন আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, তিনি কোনও ঘরানা সৃষ্টি করেন নাই অথবা নূতন পদ্ধতিও রচনা করেন নাই। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে

স্বীকৃত সঙ্গীত রচনা ও প্রচলিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি-সমূহ সংগ্রহ করেন। ইহার পর তিনি সেগুলিকে একটি সুসম্বদ্ধ রূপ দিয়া হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সামগ্রিক কাঠামো দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা বরং সঙ্গীতজ্ঞদের প্রশংসা লাভ করার উপযুক্ত ছিল। ভাতখণ্ডে পরম্পরাগত সঙ্গীতজ্ঞদের চেয়ে আর একটু অগ্রসর হইয়া খোলাখুলিভাবে বলিয়াছিলেন যে, প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত সঙ্গীতের সহিত আধুনিক ভারতীয় সঙ্গীতের মিল নাই বলিলেও চলে। অতএব প্রকৃতপক্ষে তিনি বর্ত্তমান প্রচলিত সঙ্গীতকে উপযুক্ত ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার কাজের সমালোচনা ও বিরুদ্ধতার এই ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব যে, তাঁহার এই নূতন পদ্ধতির দ্বারা মহান গায়কদের অমূল্য সঙ্গীত-সম্পদ শিক্ষার্থীদের নিকট সুলভ হইয়া যায়। ইহা বিরোধীদের পছন্দ নয়। যে পুরাতন ধারণার গণ্ডীর মধ্যে পেশাদার সঙ্গীতজ্ঞদের জীবন কাটিয়াছে এবং যে ধারণার ফলে সঙ্গীত বেশী লোকের মধ্যে বিস্তার লাভ করে নাই তাহা হইল এই যে সঙ্গীতকে অমূল্য সম্পদের মত রক্ষা করিতে হয়, দু'-একজন বিশিষ্ট শিষ্য ব্যতীত আর কাহারও নিকট ইহা হস্তান্তর করা যায় না। এইজন্য ভাতখণ্ডের পদ্ধতি তাঁহারা পছন্দ করেন নাই।

অনেক সঙ্গীতজ্ঞ এই অভিযোগ করিতেন যে, ভাতখণ্ডে কেবল সঙ্গীতের তত্ত্বের দিকটাই বুঝিতেন। এই পুস্তকের পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠার বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে যে, বাস্তবপক্ষে তত্ত্ব ও প্রয়োগ—এই উভয়ের যথাযথ মূল্য সম্বন্ধে তাঁহার অত্যন্ত

স্পষ্ট ধারণা ছিল। সঙ্গীতের ঔপপত্তিক তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানকে তিনি সঙ্গীতের উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য মনে করিতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি প্রয়োগ ও অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তার উপরও বিশেষ জোর দিতেন। এ বিষয়ে তিনি বলিতেন যে, কেহ সঙ্গীত ভাল ভাবে শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে অবশ্যই কুশলী পেশাদার গায়কের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সঙ্কীর্ণ পুরাতন কুসংস্কারের ফলে যে মিথ্যা কোলাহল উঠিয়াছিল তাহা সহজে মরে নাই। এখনও পর্য্যন্ত অনেক গায়ক এই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকেন এবং কিছু সংখ্যক ওস্তাদ ও শিষ্যকে ভাতখণ্ডে ঘরানার লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিজস্ব কোনও ঘরানা ছিল না, অথবা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সর্ব্বজনস্বীকৃত পদ্ধতি হইতে ভিন্ন কোনও পদ্ধতি ছিল না। আজ সমস্ত সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ভাতখণ্ডের সযত্নরচিত সঙ্গীতশিক্ষাপ্রণালী অনুসৃত হইতেছে। ইহার দ্বারা তাঁহার সার্থক সাধনার প্রতি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দেখানো হইতেছে। এমন কি, যাঁহারা ভাতখণ্ডের সহিত একমত নন বলিয়া প্রকাশ করেন তাঁহারাও ভাতখণ্ডের পাঠ্য পুস্তককে সামান্যই পরিবর্ত্তন করিয়া নিজেদের বিভিন্নতা দাবি করেন। বস্তুতপক্ষে এখন যে-সব নূতন পাঠ্যপুস্তক রচিত হইতেছে তাহাতে ভাতখণ্ডের পদ্ধতি অনুসরণ করা হইতেছে। ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রচলিত গায়নরীতি ও বিখ্যাত ঘরানার সুপরিচিত সঙ্গীতরচনার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি পাঠ্যপুস্তকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার

নিজস্ব অবদান ছিল সঙ্গীতকে সুসংবদ্ধ ও শ্রেণীবদ্ধ করা। ইহা কেবল দীর্ঘদিনব্যাপী গভীর অধ্যয়নের ফলে সম্ভব হইয়াছিল।

—

পরিশিষ্ট

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রণীত পুস্তকের তালিকা

পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মৌলিক রচনা ও যে সকল প্রাচীন পুস্তক তিনি সম্পাদনা করিয়া নিজ ব্যাখ্যা সহকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হইল।

১। তাঁহার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক চারখণ্ডে লিখিত 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি'। মারাঠী ভাষায় লিখিত ২৫০০ পৃষ্ঠার এই পুস্তকে আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

২। সঙ্গীতের তত্ত্ব ও রাগের সংজ্ঞা সম্বন্ধীয় সংস্কৃতে লেখা দুটি মৌলিক রচনা, 'শ্রী মল্লক্ষ্য সঙ্গীতম' ও 'অভিনব রাগ মঞ্জরী'।

৩। ছয় খণ্ড হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির উপরে লিখিত 'ক্রমিক পুস্তক মালিকা'। ইহার ভূমিকায় সঙ্গীতের সাধারণ তত্ত্ব, রাগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও স্বরবিস্তার ইত্যাদি আছে। সব কয়টি পুস্তক মিলাইয়া প্রায় ১০০০টি পরম্পরাগত সঙ্গীত রচনা ও নিজস্ব প্রায় ৩০০টি সঙ্গীত রচনা ইহাতে আছে।

৪। তাঁহার গবেষণামূলক ভ্রমণের সময়ে গ্রন্থাগার ও বন্ধুদের নিকট হইতে প্রাপ্ত 'রত্নাকরে'র পরের যুগের সংস্কৃত পুস্তকের তালিকা,—

(ক) রামামাত্যের 'স্বরমেলা কলানিধি'

(খ) পণ্ডিত ভেঙ্কটমাখীর 'চতুর্দ্দণ্ডী প্রকাশিকা'

(গ) 'রাগ লক্ষণম্' (লেখকের নাম জানা যায় নাই)

(ঘ) তাঞ্জোরের রাজা তুলাজেন্দ্রের 'সঙ্গীত সারামৃতোদ্ধার'

(ঙ) দ্বারভাঙ্গার লোচন কবি ঝায়ের রাগ তরঙ্গিণী

(চ) পুণ্ডরীক বিঠ্‌ঠল এর চারটি গ্রন্থ,—(১) 'ষড়রাগ চন্দ্রোদয়', (২) 'রাগ মঞ্জরী', (৩) 'রাগ মালা', (৪) 'নর্ত্তন নির্ণয়'

(ছ) হৃদয় নারায়ণ দেবের (১) 'হৃদয় কৌতুক' ও (২) 'হৃদয় প্রকাশ'

(জ) ভাবভট্টের (১) 'অনূপ সঙ্গীত রত্নাকর', (২) 'অনূপ সঙ্গীত বিলাস', (৩) 'সঙ্গীত অনূপ অঙ্কুশ'

(ঝ) পণ্ডিত শ্রীনিবাসের 'সঙ্গীতরাগতত্ত্ববিবোধ'

(ঞ) শ্রীকণ্ঠের 'সঙ্গীত কৌমুদী'

(ট) পূর্ণ কবি নামে একজন কুমায়ুনী পণ্ডিতের রচিত হিন্দী গ্রন্থ 'নাদোদধি' সম্পাদনা করিয়া তিনি 'সঙ্গীত' নামে ম্যারিস কলেজের সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

(ঠ) 'চত্বারিংশত-শত রাগ নিরূপণম্'

(ড) 'অষ্টোত্তরশত তাল লক্ষণম্'

৫। সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত প্রাচীন যুগের সঙ্গীত তত্ত্বের উপরে ইংরাজী ভাষায় লিখিত দুইটি তথ্যপূর্ণ ও শিক্ষামূলক প্রবন্ধ :

(১) A Short Historical Survey of the Music of Upper India এবং (২) A Comparative Study of Some of the Leading Music Systems of the 15th, 16th, 17th and 18th Centuries.

৬। আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের তত্ত্বের উপর লিখিত ইংরাজী পুস্তক Hindusthani Music।

৭। 'লক্ষণ গীত সংগ্রহ' নামক মাসিক পত্রিকা। ইহাতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত তত্ত্ব ও স্বরলিপি সহিত রাগের লক্ষণ গীত প্রকাশিত হইত। সম্ভবতঃ তিনি ঠাট অনুযায়ী পত্রিকা প্রকাশের চিন্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাত্র তিনটি সংখ্যা কল্যাণ, বিলাওল ও খাম্বাজ ঠাটের রাগসহ প্রকাশিত হয়। ইহার পরে,

৮। 'গীত মালিকা' নামে মাসিক পত্রিকার ২৩টি খণ্ড প্রকাশিত

হয়। প্রত্যেক সংখ্যায় প্রায় পঁচিশটি স্বরলিপিসহ পরম্পরাগত ধ্রুপদ, খেয়াল, তারাণা, সাদরা, ভজন ইত্যাদি ও লক্ষণ গীত থাকিত। ইহার পরে 'ক্রমিক পুস্তক মালিকা'র পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয় ও 'গীত মালিকা'র সমস্ত সঙ্গীত এই পুস্তকগুলিতে পুনঃ প্রকাশিত হয় এবং 'গীত মালিকা'র প্রকাশন বন্ধ হইয়া যায়।

৯। মারাঠী ভাষায় লিখিত 'পারিজাত প্রবেশিকা'। ইহা 'সঙ্গীত পারিজাত' নামক পুস্তকের স্বর অধ্যায়ের উপর টীকা।

১০। মারাঠী ভাষায় লিখিত 'রাগ বিবোধ প্রবেশিকা'। ইহা 'রাগ বিবোধের' স্বর অধ্যায়ের উপর টীকা।

১১। কাশীনাথ শাস্ত্রী ও আপা-তুলসীর লিখিত তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থ (ক) 'সঙ্গীত সুধাকর' (খ) 'সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম-অঙ্কুর' (গ) 'সঙ্গীত রাগ চন্দ্রিকা' এবং একখানি হিন্দী গ্রন্থ 'সঙ্গীত রাগ চন্দ্রিকা সার' এই চারখানি পুস্তক পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রীয় জীবনচরিতমালা

প্রধান সম্পাদক :

ডক্টর বি. ভি. কেশকার

সম্পাদক :

অধ্যাপক কে. স্বামীনাথন শ্রী মহেন্দ্র ভি. দেশাই

যে সব গ্রন্থ প্রস্তুতির পথে

১। নরসিম্‌হ মেহ্‌তা — শ্রী কে. কে. শাস্ত্রী
২। নামদেব — শ্রী এল. জি. যোগ
৩। স্বামী বিবেকানন্দ — শ্রী এ. কে. শাস্ত্রী
৪। স্বামী রামদাস — অধ্যাপক এম. জি. দেশমুখ
৫। স্বামী রামতীর্থ — শ্রী ডি. আর. সুদ
৫। স্বামী দয়ানন্দ — শ্রী বীরেন্দ্রকুমার সিং
৭। চৈতন্য — শ্রী দিলীপকুমার মুখার্জী
৮। বানা — ডক্টর লালানজী গোপাল
৯। সিদ্ধরাজা — শ্রী চিনুভাই জে. নায়ক
১০। হাব্বা খাতুন — শ্রী এন. এল. চাওলা
১১। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য — ডক্টর রাজবালী পাণ্ডে
১২। পুলকেশী—দি সেকেণ্ড — ডক্টর জয়প্রকাশ সিং
১৩। কণিষ্ক — শ্রী এ. কে. নারায়ণ
১৪। ভোজ পারমার — শ্রী সি. কে. ত্রিপাঠী
১৫। পৃথ্বীরাজ চৌহান — ডক্টর বিদ্যা প্রকাশ
১৬। শাম্মী জয়সিংহ — শ্রী আর. এস. ভাট
১৭। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ — শ্রী মালিক রাম
১৮। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য — শ্রী সীতাচরণ দীক্ষিত

১৯।	জি. জি. আগারকার	প্রঃ জি. পি. প্রধান
২০।	পুরাণদারা দাশ	শ্রী ভি. সিতারামাইয়া
২১।	তানসেন	ঠাকুর জয়দেব সিং
২২।	রামানুজন	ডক্টর বি. ভি. শর্মা
২৩।	জে. সি. বোস	শ্রী এস. এন. বসু
২৪।	সারফোজি ভোঁস্‌লে	শ্রী আর. গোপীনাথ
২৫।	বাসবান্না	শ্রী এম. চিদানন্দ মূর্তি

রাষ্ট্রীয় জীবনচরিতমালার
প্রকাশিত পুস্তকাবলী

১।	গুরু গোবিন্দ সিং (৩য় সংস্করণ)—ডক্টর গোপাল সিং	২˙০০
২।	কবীর—ডঃ পারশনাথ তেওয়ারী	১˙৭৫
৩।	রহিম—ডঃ সমর বাহাদুর সিং	২˙০০
৪।	মহারাণা প্রতাপ (হিন্দী)—শ্রী আর. এস. ভাট	১˙৭৫
৫।	অহল্যা বাঈ (হিন্দী)—শ্রীহীরালাল শর্মা	১˙৭৫
৬।	ত্যাগরাজ—অধ্যাপক পি. শম্বমূর্তি	২˙০০
৭।	পণ্ডিত ভাতখণ্ডে—ডাঃ এস. এন. রতনজনকার	১˙২৫
৮।	পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর—শ্রী ভি. আব, আতাভালে	১˙২৫
৯।	শঙ্করদেব—ডঃ মহেশ্বর নেওগ	২˙০০
১০।	রাণী লক্ষ্মীবাঈ (হিন্দী)—শ্রী বৃন্দাবনলাল বর্মা	১˙৭৫
১১।	সুব্রমানিয়া ভারতী—ডাঃ মিসেস প্রেমা নন্দকুমার	২˙২৫
১২।	হর্ষ—শ্রী ভি. ডি. গাঙ্গল	১˙৭৫
১৩।	সমুদ্রগুপ্ত (হিন্দী)—শ্রী লালানজী গোপাল	১˙২৫
১৪।	কাজী নজরুল ইসলাম—শ্রী বসুধা চক্রবর্তী	২˙০০
১৫।	গুরু নানক—ডঃ গোপাল সিং	২˙০০
১৬।	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য (হিন্দী)—শ্রী লালানজী গোপাল	১˙৫০
১৭।	শঙ্করাচার্য্য—অধ্যাপক টি. এম. পি. মহাদেবন	২˙০০
১৮।	আমীর খসরু—শ্রী সৈয়দ গুলাম সামনানী	১˙৭৫
১৯।	নানা ফড়নবীশ—ডঃ ওয়াই. এন. দেওধর	১˙৭৫

২০। রণজিৎ সিং—শ্রী ডি. আর. সুদ ২'০০
২১। হরিনারায়ণ আপ্তে—ডঃ এম. এ. কারানডিকর ১'৭৫
২২। আর. জি. ভাণ্ডারকর—ডঃ এইচ. এ. ফাদকে ১'৭৫
২৩। মুথুস্বামী দীক্ষিতার—
জাষ্টিস টি. এল. ভেঙ্কটরামা আইয়র ২'০০
২৪। মির্জা গালিব—শ্রী মালিক রাম ২'০০
২৫। সুরদাস (হিন্দী)—শ্রী ব্রজেশ্বর বর্মা ২'০০
২৬। রামানুজাচার্য্য—শ্রী আর. পার্থসারথি ১'৭৫
২৭। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শ্রী এস. কে. বোস ২'০০

'ভারতবর্ষ—দেশ ও দেশবাসী' সিরিজের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

	বিশেষ সংস্করণ	সুলভ সংস্করণ
১। ফ্লাওয়ারিং ট্রিজ		
ডঃ এস. এস. রণধাওয়া	৯·৫০	৬·৫০
২। আসামীজ লিটারেচার		
অধ্যাপক হেম বড়ুয়া	৭·৫০	৫·০০
৩। কমন ট্রিজ		
ডঃ এইচ. শান্তাপাউ	৮·২৫	৫·২৫
৪। স্নেক্‌স্‌ অফ্‌ ইণ্ডিয়া		
ডঃ পি. জে. দেওরাস্‌	৯·৫০	৬·৫০
৫। ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড সয়েল		
ডঃ এস. পি. রায়চৌধুরী	৮·২৫	৫·২৫
৬। মিনারেলস অফ্‌ ইণ্ডিয়া		
শ্রীমতী মেহের ডি. এন. ওয়াদিয়া	৮·২৫	৫·২৫
৭। ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল্‌স		
শ্রীহরবন্‌শ সিং	৮·০০	৪·২৫
৮। ফরেস্ট্‌স্‌ অ্যাণ্ড্‌ ফরেষ্ট্রি		
শ্রী কে. পি. সগরেইয়া	৮৫০	৫·২৫
৯। জিওগ্রাফি অফ্‌ রাজস্থান		
ডঃ ভি. সি. মিশ্র	৮·২৫	৬·০০
১০। গার্ডেন ফ্লাওয়ার্স		
ডঃ বিষ্ণু স্বরূপ	৯·৫০	৬·০০
১১। পপুলেশন		
ডঃ এস্‌. এন. আগরওয়াল	৭·০০	৩·৭৫

		বিশেষ সংস্করণ	সুলভ সংস্করণ
১২।	নিকোবর আইল্যাণ্ডস		
	শ্রী কে. কে. মাথুর	৯·০০	৫·৫০
১৩।	কমন বার্ডস্		
	ডঃ সালিম আলি ও শ্রীমতী লায়েক ফতেআলী	১৫·০০	৯·০০
১৪।	ভেজিটেব্‌ল্‌স		
	ডঃ বি. চৌধুরী	৮·২৫	৫·২৫
১৫।	ইকনমিক জিওগ্রাফি অফ্ ইণ্ডিয়া		
	অধ্যাপক ভি. এস. গণনাথন	৮·২৫	৫·২৫
১৬।	ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি অফ্ ইণ্ডিয়া		
	অধ্যাপক সি. এস্. পিছমুথু	৮·২৫	৫·২৫
১৭।	মেডিসিন্যাল প্ল্যাণ্টস্		
	ডঃ এস. কে. জৈন	৯·০০	৫·৭৫
১৮।	জিওগ্রাফি অফ্ ওয়েষ্ট বেঙ্গল		
	অধ্যাপক এস. সি. বসু	৯·০০	৬ ০০
১৯।	জিওলজি অফ্ ইণ্ডিয়া		
	ডঃ এ. কে. দে	৮·৫০	৫·২৫
২০।	দি মনসুন্‌স		
	ডঃ পি. কে. দাস	৭·৫০	৪·২৫
২১।	রাজস্থান		
	ডঃ ধরম পাল	৭·৭৫	৪·৫০
২২।	ইণ্ডিয়া—এ জেনারেল সার্ভে		
	ডঃ জর্জ কুরিয়ন	৯·৫০	৬·০০
২৩।	ট্রাইব্‌স্ অফ আসাম		
	শ্রী এস্ বরকটকি	৮·০০	৪ ৭৫
২৪।	টেম্পল্‌স অফ্ নর্থ ইণ্ডিয়া		
	শ্রীকৃষ্ণ দেব	৭·৫০	৪·০০

		বিশেষ সংস্করণ	সুলভ সংস্করণ
২৫।	প্ল্যাণ্ট ডিজিসেস		
	ডঃ আর. এস্. মাথুর	৮·০০	৪·৭৫
২৬।	ফ্রুটস		
	অধ্যাপক রণজিৎ সিং	৯·২৫	৫·৭৫
২৭।	আসাম		
	শ্রী এস. বরকটকি	৮·০০	৪·৭৫